আমার বন্ধু

বুদ্ধদেব বসু

শ্রী সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু-কে
দিলাম

আমার বন্ধু

হেরিডিটির রহস্য চিন্তা করলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়; আমি যে লেখক হয়েছি, আমার জন্ম দিয়ে বিচার করতে গেলে এ-ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, প্রায় অস্বাভাবিক ঠেকে। কারণ, আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলে, যতদূর জানা যায়, কারো কোনো আর্টের প্রতি কোনোরকম উন্মুখতা ছিলো না। উভয় দিকেই, নিরেট মধ্যবিত্ততা থেকে আমি জাত। যতদূর জানা যায়। কিন্তু জানা কতদূরই বা যায়? যেখানে আমাদের জ্ঞান পৌঁছতে পারে না, সেই দূর অতীতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পশ্চাতে—আমার কোনো পূর্ব্বপুরুষ হ'য়ে সেখানে আমি ছিলাম; এবং সেই পূর্ব্বপুরুষের হয়-তো খানিকটা সৃষ্টিকারী ক্ষমতা ছিলো; সেই ক্ষমতা, ভ্রূণাবস্থায় ক্রোমোজোমদের অজ্ঞেয় বিন্যাসের ফলে আজ আমি পেয়েছি বহু শতাব্দী পর, সহস্র নর-নারীকে অতিক্রম করে' সেই ক্ষমতার বীজ কী করে' যে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হ'লো, সৃষ্টির এই রহস্য—এমন

যে আমাদের সর্ব্বজ্ঞ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, তা এখনো উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি। যে-সম্ভাবনা লাখে একও নয়, তা-ই পরিপূর্ণ হ'লো; সাহিত্যিক ক্ষমতা নিয়ে আমি জন্মালাম।

অবিশ্যি সে-সম্বন্ধে সচেতন হ'তে জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছিলো। জ্ঞান হ'বার সঙ্গে-সঙ্গে কী করে' যেন আমার মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিলো যে সাংঘাতিক একটা-কিছু হবার জন্য আমি উদ্দিষ্ট। কিন্তু সেই সাংঘাতিকত্ব যে সাহিত্যের দিকে হবে, তা উপলব্ধি কর্‌লাম সেদিন, হঠাৎ যখন ইংরিজি ভাষায় এক শোক-গাথা রচনা করে' ফেল্‌লাম। আমার বয়েস তখন দশ; নোয়াখালিতে ঠিক নদীর ধারে ভারি সুন্দর একটা বাড়িতে আমরা থাকতাম। নদীর ধারে বলছি—কিন্তু গোড়ায় বাড়িটা ছিলো নদী থেকে মাইল খানেক দূর; দেখতে-দেখতে মধ্যবর্ত্তী মাটি অদৃশ্য হ'লো; নদীটা ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। শেষে এমন সময় এলো, যখন আর ও-বাড়িতে বাস করা যায় না; নদীর হাতে বাড়িকে সমর্পণ করে' আমাদেরকে সরে' পড়তে হবে। ব্যাপারটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং শোকাবহ বলে' আমার মনে বাজলো; ঈশ্বরের রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল অবিচারের প্রথম দৃষ্টান্তে মর্ম্মাহত হলাম। লিখলাম সেই বাড়িকে উদ্দেশ্য করে' ইংরিজিতে এক বিদায়-পদ্য। যথাসময়ে এবং যথাক্রমে সে-পদ্য হ'লো আবিষ্কৃত; আমার

স্বজনবর্গ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। আমার এই অসামান্য কীর্ত্তিকে তাঁরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না; বুঝে উঠতে পারলেন না, কী করবেন আমাকে নিয়ে। তাঁরা উল্লসিত হ'লেন, উদ্‌ভ্রান্ত হ'লেন, গর্ব্বিত হ'লেন, সন্দিহান হ'লেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে দশ বছরের বালক আমি বাড়ির মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি হ'য়ে উঠলাম। দেখতে-না-দেখতে আমার কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সেই ছোট্ট শহরের সর্ব্বত্র। নিজের সম্বন্ধে আমার ভীষণ উচ্চ ধারণার এমন একটা জলজ্যান্ত সমর্থন পেয়ে মনটা বেশ খুসি হ'য়ে উঠলো।

আমার কবি-কীর্ত্তি যা'তে ওখানেই ক্ষান্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমার এক আত্মীয় আমাকে উপহার দিলেন এক খাতা—হায় রে কালান্তক, মর্ম্মান্তিক খাতা! অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে আমি লেগে গেলুম সেই খাতার শাদা পৃষ্ঠাগুলো ভরাতে; এবং সেই যে নেশা করলাম (কারণ, নেশা ছাড়া এটা আর কী?), আজ পর্য্যন্ত আমি তা'র দাসত্ব করছি; সাধ্য নেই, তা'র সর্পিল, বিষাক্ত আলিঙ্গন থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারি। বরং, যত দিন যাচ্ছে, এ-নেশা ততই কঠিন, ততই ভয়ানক হ'য়ে উঠছে। প্রথমে ছিলো, লিখতে ভালো লাগে; তারপর হ'লো, না-লিখলেই খারাপ লাগে; এখন হয়েছে, লিখতে ভালো লাগে না, আবার না-লিখলেও খারাপ লাগে। নেশাখোরের এটা হচ্ছে চরম অবস্থা। মাতাল যে, একটা সময় আসে, যখন মদের কথা ভাবতেই তা'র হৃৎকার

হয়; তবু, সন্ধে হ'তেই তা'র বোতল আর গেলাশ নিয়ে বসা চাই। তেমনি, লেখবার কথা ভাবলে আমার এখন মনের মধ্যে যন্ত্রণা হ'তে থাকে—কিন্তু উপায় নেই, তবু আমাকে বসতেই হয় কাগজ আর কলম নিয়ে; এবং আত্ম-নিপীড়ন যত নিষ্ঠুর হয়, কোনো-এক বিকৃত উপায়ে মন তা-ই থেকেই উপভোগ নিঙড়ে বা'র করে। উৎকট উপভোগ! কত উৎকট, বুঝতে পারি নেশার হাত থেকে মাঝে-মাঝে যখন প্রশান্ত বিরতি আসে। যদি কখনো প্রশান্ত বিরতি না আসতো! যদি আমাকে আদৌ এ-নেশা পেয়ে না বসতো! কিন্তু দেরি হ'য়ে গেছে; বড় বেশি দেরি হ'য়ে গেছে; এখন আর এ-সব আক্ষেপ করবার সময় নেই।

যা বলছিলাম, সেই খাতা ভরিয়ে তোলবার চেষ্টায় ভীষণ উৎসাহে আত্ম-নিয়োগ করলাম। মধুসূদন দত্তর মত, গোড়ায় মাতৃ-ভাষার প্রতি আমার তাচ্ছিল্যের সীমা ছিলো না; পরিণত শৈশব পর্য্যন্ত ভালো করে' বাঙ্লা শিখি নি। কিন্তু মধুসূদনের অনেক আগেই বিভাষায় সাহিত্য-রচনার মূঢ়তা আমি উপলব্ধি করেছিলাম; ইংরিজিতে ঐ আমার প্রথম প্রচেষ্টা—এবং শেষ। আমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাই হ'লো বাঙ্লায়; তা'র বিষয়—এখনো আমার মনে আছে—ছিলো 'ঊষা'। পয়ারে, ত্রিপদীতে, মিলের পরে মিল দিয়ে দিয়ে, রোজ দু'একটি করে' নিয়মিতরূপে আমার পদ্য-রচনা চলতে লাগলো। ভেবে-ভেবে আমি সব

কাব্যোপযোগী বিষয় বা'র করতাম; সন্ধ্যা, নদী, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, ফুল, শিশু—আমার কাব্য-ছাগশিশু সদ্য-উন্মেষিত দাঁত দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু পরখ করে' দেখতে লাগলো। সৌভাগ্যবশত, বাল্যকালে আমাকে ইস্কুলে পড়ে' সময় নষ্ট করতে হয় নি, প্রচুর সময় ছিলো আমার হাতে; অবাধ, অক্ষুণ্ণ, দিন থেকে দিন প্রবল-তরো গতিতে পদ্যের পর পদ্য নিঃসৃত হ'তে লাগলো; কয়েক মাসের মধ্যেই খাতা উঠলো ভরে'।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হ'লো; আমার সাহিত্যিক জীবনের সেটাই সব চেয়ে প্রধান ঘটনা বলে' ধরা যেতে পারে। আমার আর-এক আত্মীয় আমাকে একখানা রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা উপহার দিলেন। (চারুবাবুর চয়নিকা—ছোট সাইজের, ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিখুঁত ছাপার। হায় সেই অতীত স্বর্ণ-যুগ, দশজনের ভোট কুড়িয়ে যখন চয়নিকা তৈরি হ'তো না, যখন জাঁদ্‌রেল আকৃতিতে, ভীম ওজনে, বিশ্বভারতী প্রেসের যত্নহীন ছাপায়, তারিখ-কণ্টকিত, এ-অ্যা-র উচ্চারণের পার্থক্য-চিহ্ন-বিভূষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কেতাব চয়নিকা বেরুতো না!) সেই বই খুলে প্রথম পৃষ্ঠায় পড়লাম:

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিলো প্রাণের 'পর—

আর সঙ্গে-সঙ্গে, আমার মনেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'লো। এক

সকালবেলায়, দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীটের বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখতে-দেখতে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর মুখ থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গিয়েছিলো; আমার পৃথিবীর মুখ থেকেও পর্দ্দা সরে' গেলো, জীবনে প্রথম যেদিন রবীন্দ্র-কাব্যের সংস্পর্শে এলাম। আমার চোখের সামনে সমস্ত সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটলো; আকাশের রঙ্, ঘাসের রঙ্, মানুষের কথাবার্ত্তা, হাসির শব্দ— সব যেন এক গভীরতরো ইঙ্গিত নিয়ে আমার মনকে স্পর্শ করতে লাগলো। বদলে গেলো সমস্ত পৃথিবীর চেহারা; বদলে গেলাম আমি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিলো প্রাণের 'পর—

ভালো করে' বোঝবার ক্ষমতা তখনো হয় নি; বিস্ময়ের আনন্দের বন্যায় যা আমাকে তখন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, তা হচ্ছে কবিতার ছন্দ, তা'র ধ্বনি, সঙ্গীত। উন্মাদনার মত সেই সঙ্গীত আমাকে অভিভূত করলো।

আনন্দময়ী মূরতি তোমার
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা—
অমৃত-সরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

'পতিতা'র প্রকৃত বিষয়-বস্তু না বুঝেও এই সঙ্গীতকে ঘিরে আমার

বালক-মন অস্পষ্ট রহস্যের ইন্দ্রজাল বুনে চললো; আমার মনের মধ্যে তা'র অবিশ্রান্ত গুঞ্জন; সেই সঙ্গীতের অশরীরী সঞ্চরণে আমার সমস্ত দিন মদির হ'য়ে উঠলো। গৃহের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে আমি একা এক গোপন জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলাম; সুরের মায়াচক্রের মধ্যে স্বেচ্ছা-বন্দী, আমি জীবনের প্রথম পূজার দেবতাকে আবিষ্কার করে' ধন্য হ'লাম। চয়নিকা হ'য়ে উঠলো আমার কাছে একটা অফুরন্ত খনি; এত ঐশ্বর্য্য একসঙ্গে পেয়ে প্রথমটায় আমি কী-রকম একেবারে দিশেহারা হ'য়ে উঠলাম। সেই যে রবীন্দ্র-মোহে পড়লাম, তা থেকে নিজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে আনতে অনেক, অনেকদিন কেটে গেলো। এখনো কি সম্পূর্ণ-রূপে মুক্ত হ'তে পেরেছি? সন্দেহ হয়।

তখন—প্রথম চয়নিকা পড়বার পর—যা আরম্ভ হ'লো, সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, সেই দাস্য অনুকরণ—ওঃ, তা'র তুলনা হয় না। যা-কিছু আগে লিখেছিলাম, সব যে রাবিশ, নিতান্ত ছেলেমানুষি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ মনে রইলো না। এগারো বছরের আমি মৃদু হাস্য করে' দশ বছরের আমির পিঠ চাপড়ালাম। সদ্য গিরি-গুহা-মুক্ত ঝর্নার মত উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ছুটলো আমার রবীন্দ্র-জাগরিত কাব্যস্রোত। সমস্ত চয়নিকা বলতে গেলে গুলে গিলে ফেললাম; তারপর, বিপর্য্যস্ত, বিকৃত হ'য়ে সেই সব আমার কলমের মুখ দিয়ে বেরুতে লাগলো; শিশুর

মুখ দিয়ে দুধ যেমন ছানা হ'য়ে বেরোয়। পড়লাম 'শুধু অকারণ পুলকে—'; তৎক্ষণাৎ লিখে ফেললাম এই গোছের এক পদ্য:

আজি উজ্জ্বল আলোকে
আমার পরাণ আপনা হারায়ে
ছুটিছে ব্যাকুল পুলকে।

'বর্ষা-সন্ধ্যা' পড়ে' হঠাৎ মেঘাক্রান্ত রক্ত-সূর্য্যাস্তের প্রেমে পড়ে' গেলাম; লিখলাম:

আজকে শুধু তোমার হাতের
মধুর পরশে,
হৃদয় আমার ফুলের মত
ফুটবে হরষে।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমনি অজস্র। যখনই যে-কবিতা পড়তাম, আমার মনের অপরিণত পাক-যন্ত্র থেকে তা ছানা হ'য়ে বেরুতোই। খাতার পর কবিতার খাতা ফেঁপে উঠতে লাগলো। তখন পর্য্যন্ত ভাবি নি, কবি ছাড়া আমি আর-কিছু হ'বো; গদ্য জিনিসটা যে কষ্ট করে' কাগজের উপর কলম দিয়ে লেখবার উপযুক্ত, তা আমি মনে করতাম না। কিন্তু এমন সময় আর-একটা অ্যাক্সিডেণ্ট্ ঘটলো। আমাদের পরিবার-মহলের মধ্যে কয়েক দিন পর-পর দুটো বিয়ে হ'য়ে গেলো। সেই ডবল বিয়ের উপলক্ষ্যে যত রাজ্যের বাঙ্লা উপন্যাস আর গল্পের বই এসে পড়লো আমার হাতে; আমার—

কারণ, যে-মহিলাদেরকে বইগুলো উপহৃত হয়েছিলো, সেগুলোর দিকে তাকাবার সময় তাঁদের ছিলো না—অন্তত, তখন ছিলো না। বইগুলো আমি এক নিঃশ্বাসে পড়ে' ফেললাম; ঢক্‌ঢক্‌ করে' গিলে ফেললাম, বলা যায়। (প্রসঙ্গক্রমে, বাঙ্‌লা কথা-সাহিত্যে আমার যা-কিছু পাঠ, তা'র অনেকটা সেই যাত্রায় হ'য়ে যায়; যেটুকু বাকি ছিলো—ইস্কুলে থাকতে একবার অসুস্থ হ'য়ে মাস দুই রাঁচিতে কাটাতে বাধ্য হই—যেটুকু বাকি ছিলো, হিন্দুবাসী কেরানিদের লাইব্রেরির অনুগ্রহে তা শেষ করে' ফেলি।) বাঙ্‌লা গল্পের একবার স্বাদ পেয়ে আমার মত বদলে গেলো; আরম্ভ করলাম গল্প লিখতে। আমার সরস্বতী তখন খাতার কারাগারে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন; তাঁকে আরো প্রচুর ক্ষেত্র দেবার জন্য দরকার হ'লো এক হাতে-লেখা মাসিকপত্র বা'র করা। সে-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলাম আমি; তা'র অন্তর্গত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ-কৌতুক, সাহিত্য-সমালোচনা—বেশির ভাগ জিনিস লিখতাম আমি; এবং আমার মত এত উৎসাহী পাঠকও তা'র আর ছিলো না। না—একজন ছিলো, যে আমার সম্পাদিত সেই মাসিকপত্র বোধ হয় আমার চেয়েও বেশি উৎসাহ নিয়ে পড়তো; কারণ, প্রতি সংখ্যায়ই থাকতো তা'র দু'একটা লেখা। তা'র উপর, কাগজের প্রচ্ছদপট হ'তো তা'র আঁকা। বস্তুত, মাসিকপত্র পরিচালনায় সেই আমার প্রথম প্রচেষ্টায় সে ছিলো আমার সহকারী। তা'র

নাম ছিলো তা'র জন্ম ও পারিপার্শ্বিকের পক্ষে একটু অসাধারণ—ভবভূতি। জজকোর্টের টাইপিস্‌ট্‌ তা'র বাবা বোধ হয় কোনো এক প্রচণ্ড দুরাশার মুহূর্ত্তে ছেলের এই নামকরণ করে' ফেলে ছিলেন; তারপর নিজের এই ভীষণ দুঃসাহসে নিজেই ভীত হ'য়ে প্রাঞ্জল, অভিমানহীন বিভু নামে ওকে ডাকতে আরম্ভ করে-ছিলেন। বিভু বলে'ই ওকে সবাই ডাকতো;—কিন্তু, এমন যে ওর চমৎকার, জমকালো ভবভূতি নাম, যা কিনা ওর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়, তা অব্যবহারে লুপ্ত হ'য়ে থাকবে, আমি এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বিদ্রোহ করেছিলাম। আমার কান তখন থেকেই তৈরি হ'য়ে আসছিলো; একটা ধ্বনিময় শব্দ পেলে আমি অস্পষ্টভাবে তা'কে চিনতে পারতাম; তাই আমি করলাম ওর নামের উদ্ধার-সাধন।

ভবভূতির সেই ছেলেবেলাকার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। কালো, রোগা-মত এক ছেলে, মাথায় ছোট-ছোট চুল; মুখে এমন-কোনো বিশেষত্ব ছিলো না, যা উল্লেখ করা যায়। শুধু ওর চোখের দৃষ্টি ছিলো ভীত, অসহায় গোছের, একটু নির্ব্বোধ, একটু করুণ। তখন অতটা লক্ষ্য করতাম না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সব সময় ওকে এক বেশে দেখতাম; পরণে নীল একটা হাফ-প্যাণ্ট্‌, বেল্টের অনেকটা অংশ পিছন দিকে লেজের মত ঝুলছে; গায়ে খাকি একটা শার্ট্‌। ওর পকেট-ভর্ত্তি থাকতো

ছোট-বড় নানা রকম মার্ব্বেল; মার্ব্বেল খেলায় ও ছিলো নোয়াখালি শহরের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু তা নিয়ে ওর এতটুকু গর্ব্ব ছিলো না; কোনো বিষয়ে গর্ব্ব করবার ক্ষমতাই ওর ছিলো না। ও ছিলো সেই ধরণের মানুষ, জন্ম থেকেই যা'রা বিনীত, যা'রা আনত, নিজের ক্ষুদ্রতা-বোধকে যা'রা কোনোরকমেই কাটিয়ে উঠতে পারে না, চায়ও না; অগৌরবের তমিস্রায় লুপ্ত হ'য়ে থাকা যাদের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। মার্ব্বেল খেলার সখ আমারও খুব ছিলো, কিন্তু ক্ষমতা ছিলো না—উপরন্তু, অক্ষমের অভিমান ছিলো। ভবভূতির সঙ্গে খেলতে গিয়ে বারে-বারেই আমি বিশ্রী-রকম হেরে যেতুম; যত হারতুম, ততই জেদ চড়ে' যেতো। কখনো-কখনো, আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ভবভূতি আমাকে ইচ্ছা করে' জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করতো; এবং সে-অপমান পরাজয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর হ'য়ে আমার মনে লাগতো; রাগ করে' আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করতুম। আমি আহত হয়েছি, এই আশঙ্কায় ওর চোখের দৃষ্টি আরো ভীত, আরো অসহায় হ'য়ে উঠতো; তখন যদি কেউ ওকে বলতো যে মার্ব্বেল-নিক্ষেপে অমোঘ ওর আঙুল কেটে ফেললে আমি তুষ্ট হ'বো, ও বোধ হয় অনায়াসে তা-ই করতে পারতো।

কারণ, ভবভূতি ছিলো আমার প্রথম ভক্ত পাঠক; শুধু তা-ই নয়, আমার শিষ্য, আমার উপাসক। আমার দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক

কীর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে ও একেবারে আত্মহারা হ'য়ে পড়তো। আমার দুটো পদ্য কলকাতার মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে, সত্যি-সত্যি ছাপা হয়েছে! আমি দস্তুরমত বড়দের মত বিছানায় শুয়ে মুখ বুজে ইংরিজি গল্পের বই পড়ি! ওঃ—ভবভূতির পূজা, তা ছিলো যেমন অযাচিত, তেমনি সম্পূর্ণ, নিঃসংশয়। শুধু ওর চোখে নয়, ওর পরিবারের চোখেও আমি ছিলুম ছোটখাটো একটি গড্। ওর বাবা নিজে লেখাপড়ায় বেশিদূর এগোতে পারেন নি; ভবভূতিও ইস্কুলের পরীক্ষাগুলো অতি কষ্টে পাশ করে' যাচ্ছে মাত্র, তা-ও কখনো-কখনো করে না (অথচ, পড়াশুনো করতে ও যে অবহেলা করে তা নয়; বরং রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বই-পত্র নিয়ে বসে' অ্যাঁ-অ্যাঁ স্বর করে' ঘাড় দুলিয়ে-দুলিয়ে পড়া মুখস্থ করে)! ওর বাবা, তাই, আমার সঙ্গে ওর বন্ধুতাকে একটা পরম শুভ ঘটনা বলে' গ্রহণ করেছিলেন; অনেক সময় আমাকে মুখ ফুটেও বলতেন: 'সবাই তোমার মত হবে, তা তো আর আশা করা যায় না; তবে তোমার সঙ্গে থেকে ছেলেটার যদি কিছু হয়! তুমি ওকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ো।' আমি ফ্ল্যাটার্ড্ হতাম, লজ্জিত হতাম, একটু যে গর্ব্ব অনুভব না করতাম, তা-ও নয়। ওদিকে ভবভূতি এ-কথায় লেশমাত্র অবমাননা বোধ করতো না; বরং, আমার বন্ধুতা-অধিকারের গৌরবে নিজকে ধন্য জ্ঞান করতো। আমি যে ওর বাড়ির লোকের কাছ থেকেই অতিরিক্ত সম্মান ও

আদর পেতুম, তা'তে ওর মনে মুহূর্ত্তের জন্য ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া দূরে থাক, ওর সমস্ত অন্তরাত্মা আনন্দে জ্বল্‌জ্বল্‌ করতো। কারণ, ঈর্ষা আমরা তাদেরকেই শুধু করি, যাদেরকে সমপদস্থ জ্ঞান করি। আমার পক্ষে ফোর্ড্‌-সাহেবের ঐশ্বর্য্য ঈর্ষা করা স্রেফ পাগলামি; তেমনি, ভবভূতি আমাকে ওর চাইতে এতই উঁচু স্তরের জীব বিবেচনা করতো যে আমাকে ঈর্ষা করার কথা স্বপ্নেও ওর কখনো মনে হ'তে পারতো না। আমার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তির মধ্যে নিজকে মিলিয়ে দেয়াই ছিলো ওর সর্ব্বোচ্চ সুখ।

তাই বলে' এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুতায় কোনোরকম ভেজাল ছিলো। ও ছিলো আমার নিতান্ত একনিষ্ঠ অনুচর, পার্শ্ববর্ত্তী ছায়া, তা ঠিক; কিন্তু তা'র চেয়েও বেশি সত্য এই যে আমি ওকে ভালোবাসতাম; ওকে না হ'লে কোনো কাজ আমার সম্পূর্ণ হ'তো না, মনের সব কথা বলতাম ওর কাছে। আমাদের ছিলো—যেমন শৈশবের সব বন্ধুতাই হ'য়ে থাকে—নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা; কোনোকালে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি—তা যতই স্বল্পস্থায়ী, যতই সঘন-পত্রব্যবহারে বিকম্পিত হোক—কোনোকালে যে ছাড়াছাড়ি হবে, তা মনে করতেই প্রায় চোখে জল এসে যেতো। তবে, এ-বিষয়ে আমাদের কারো মনেই কোনো সন্দেহ ছিলো না যে মৃত্যু—সভয়ে, পবিত্র রুদ্ধস্বরে আমরা কথাটা উচ্চারণ করতাম—মৃত্যু পর্য্যন্ত

আমরা বন্ধু থাকবো। ভবভূতিকে বলতাম ভবিষ্যতের জন্য আমার সমস্ত প্ল্যান; শুনতে-শুনতে ওর চোখের ভীত, অসহায় ভাব কেটে গিয়ে তখনকার মত সেখানে এক আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতা ফুটে উঠতো; বিহ্বল নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করতো, 'তুই হাইকোর্টের জজ হ'বি—হ্যাঁরে?'

তাচ্ছিল্যের স্বরে আমি বলতাম, 'তা তো হ'বোই।'

'হাইকোর্টের জজদের কী করতে হয়?'

সে-বিষয়ে আমার মনেও খুব স্পষ্ট ধারণা ছিলো না; কিন্তু, আমার সাত পুরুষ যেন হাইকোর্টের জজিয়তি করেছে, এইভাবে আমি বলে' দিতাম, 'বাঃ, তা আর কে না জানে!'

এই ব্যাখ্যাতেই তৃপ্ত হ'য়ে ভবভূতি জিজ্ঞেস করতো, 'কত মাইনে পায় তা'রা?'

'ওঃ, ঢের!'

একটু ভেবে ভবভূতি বলতো, 'পাঁচ শো?'

'দূর বোকা। আমি আমার কল্পনাকে উদ্দাম করে' ছেড়ে দিতাম, 'হাজার-হাজার টাকা।'

'সেই কাজ তুই করবি!' বিস্ময়ে, আনন্দে ওর চোখ যেন ফেটে পড়তো। মুহূর্ত্তের এক ভগ্নাংশের জন্য সেখানে একটু সন্দেহের ছায়া-পাতও হ'তো বোধ হয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সেই বিজাতীয় সংশয়কে যেন দুই হাতে ঠেলে' ও বলে' উঠতো, 'করবি

বই কি, নিশ্চয়ই তুই জজগিরি করবি।' এমনভাবে বলতো যেন কাজটা ঠিক আমার উপযুক্ত নয়। সত্যি বলতে, নিজের উপর আমার যতটা বিশ্বাস না ছিলো, ভবভূতির ছিলো আমার উপর তা'র চেয়ে বেশি। শেষ পর্য্যন্ত, জজিয়তিটা আমার ফসকে যেতেও পারে, এ-রকম একটা সন্দেহ তখনই আমার মাঝে-মাঝে হ'তো। সেই অনুসারে, আমি অন্য রকম প্ল্যান করতুম। কখনো বা বৈষয়িকতায় ক্লান্ত হ'য়ে সঙ্কল্প করতাম, সন্ন্যেসি হ'বো। কিন্তু নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আমার স্থির ছিলো ; আমার সাহিত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কখনো ব্যত্যয় হয় নি। এবং ভবভূতির কাছে সেই-সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উজাড় করে' ঢেলে দেয়া—আমাদের বন্ধুতার তা-ই ছিলো উচ্চতম স্বর্গ। কত রবিবারের দুপুর মাসিকপত্র পরিচালনার উপলক্ষ্যে ভবিষ্যৎ-রচনার দীর্ঘ, গোপন গুঞ্জনে কেটে গেছে। আমার সেই পত্রিকার মলাটে নানা রঙের কালি দিয়ে বিচিত্র সব চিত্র কী আনন্দ আর কত কষ্ট নিয়েই যে ও আঁকতো! চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার রুচি বিকশিত হ'তে তখনো দেরি ছিলো ; ও যা আঁকতো—আঁকাবাঁকা লতা-পাতায় ঘেরা পত্রিকার ও আমার নাম—তা-ই আমার তখন ভালো লাগতো ; আন্তরিক প্রশংসা করতুম। আমার প্রশংসায় ও চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত—অনেকটা আত্মহারা হ'য়ে পড়তো ; এলোমেলোভাবে বলতো, 'না—না, এটা কিছুই হয় নি ; সামনের মাসেরটা আরো

ভালো করে' এঁকে দেবো।' এখন বুঝতে পারছি, আমি যদি ওকে পর-পর ছবির ফরমায়েস দিয়ে দশটা প্রত্যাখ্যান করে', অনিচ্ছাসত্বে একাদশটা গ্রহণ করতাম, যদি ছোটখাটো একটি অত্যাচারীর মত ওকে ব্যবহার করতাম, তা হ'লেই ও সব চেয়ে খুসি হ'তো।

ভবভূতির কার্য্যকলাপ ছবি-আঁকাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো; ও-ও যে লিখতে পারে—এবং সে-লেখা, যে-মলাটটা ও এত যত্নে এঁকে দেয়, তা'র ভিতরে স্থান পেতে পারে, এ-কথা ভাববার দুঃসাহস ওর কখনো হ'তো না, যদি না আমি ওর মাথায় তা ঢুকিয়ে দিতাম। আমার বালক-কালের সেই অবিবেচনার জন্য এখন মাঝে-মাঝে অনুতাপ হয়। যদি সে-জন্য না হ'তো, তা হ'লে ভবভূতি—হ্যাঁ, দুঃখ পেতো—কারণ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই—কিন্তু এতটা হয়-তো পেতো না। তা হ'লে সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখে, আশায়-ব্যর্থতায় ও-ও ওর জীবন একরকম করে' কাটিয়ে দিতে পারতো—আর পাঁচজন যেমন কাটায়। কিন্তু অজ্ঞাতে আমি একটা ভুল করে' ফেলেছিলাম; অনেক বছর পরে সেই ভুলের ফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে' গেলাম স্তম্ভিত হ'য়ে। সাধারণতার মসৃণ স্বর্গ থেকে ও ভ্রষ্ট হ'লো, এবং তা'র বদলে লাভ করলো—কী? অপরিসীম হতাশা; তিক্ত, তিক্ত আত্ম-গ্লানি। সাহিত্যিক হবার দুর্ব্বাসনা যদি ওর কখনো

না হ'তো, তা হ'লে বিয়ে করে', সন্তানোৎপাদন করে', দীন অজ্ঞাততার আরামময় অন্ধকারে ও দিব্যি বসবাস করতে পারতো ; এ-কথা স্বপ্নেও ওর মনে হ'তো না যে কারো চাইতে ও খারাপ আছে বা ভাগ্য ওর উপর কোনো অবিচার করছে। দুঃখের পৃথিবীতে একজন লোকের অকারণে অসুখী হবার মূলে ছিলাম আমি, আমার অপব্যয়িত জীবনের এটা অন্যতম কুকার্য্য।

যথাসময়ে ভবভূতি একদিন তা'র প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এনে আমাকে দেখিয়েছিলো—সে যে কত লজ্জায়, কত ভয়ে-ভয়ে, তা লক্ষ্য করে' তখনই আমি মনে-মনে হেসেছিলাম। জিনিসটা একটা পদ্য ; পড়ে' আমি—খুব আন্তরিকভাবে নয়—বলেছিলাম, 'চমৎকার হয়েছে।' আমার সেই প্রশংসায় ভবভূতি এমনই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলো যে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত ভালো করে' কথা কইতে পারে নি। তা'র পর থেকে আমার মাসিকপত্রের ও হ'য়ে উঠলো একজন নিয়মিত লেখক ; ওর বাবা ছেলের এই আকস্মিক সাহিত্যিক প্রতিভা-উদ্গমে উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন ; এবং আমার মত একজন তুখোড় ছেলের সঙ্গ লাভের কিছু-না-কিছু ফল যে ফলবেই, এ-কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করে' বেড়াতে লাগলেন। ছেলেবেলায়, আর যা-ই হোক, সমালোচনার ক্ষমতা হয় না, কিছু-দিনের মধ্যে ভবভূতির পদ্য আমার সত্যি-সত্যি ভালো লাগতে আরম্ভ করলো। অবিশ্যি আ মা র মত নয়—পাগল ! তা-ও কি

কখনো হ'তে পারে? কিন্তু ঠিক আমার পরেই; শুধু আমার লেখার চেয়ে নিকৃষ্ট। এ-বিষয়ে আমার মতের সঙ্গে ভবভূতির বিলক্ষণ ঐক্য ছিলো বলে' মনে হয়: কারণ, যখনই আমি ওকে কোনো প্রশংসার কথা বলতুম, বিনা ব্যতিক্রমে ও বলে' উঠতো, 'তুমি যা লেখো, রামতনু, তুমি যা লেখো!' বা ঐ তাৎপর্য্যের অন্য-কোনো কথা। যা-কিছু আমি লিখতুম, ও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতো; বলতো, 'তুমি যা-ই বলো, এ-রকম আমি কখনো লিখতে পারবো না।' আসলে, আমি করতাম রবীন্দ্রনাথের প্যারডি, আর ভবভূতি করতো আমার প্যারডি। নকল করবার পক্ষে আমার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ও খুঁজে পেলো না, এ থেকেই আমার বুঝতে পারা উচিত ছিলো যে সাহিত্যে ওর কিছু হবে না।

পুরো দু' বছর ভবভূতির সঙ্গে আমার চলেছিলো অবিচ্ছিন্ন বন্ধুতা; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে—ও-বয়েসের পক্ষে যেটা আশ্চর্য্য—একদিনের জন্যও আমাদের ঝগড়া হয় নি। তার পরে এলো সেই সময়—ওঃ, অসহ্য, অসহ্য সময়—যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'তেই হবে। বীরের মত হাসবার চেষ্টা করে' আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম; পরবর্ত্তী জীবন একসঙ্গে কাটাবার বিস্তারিত প্ল্যান দু'জনের মধ্যে আবদ্ধ রইলো। একজনকে না হ'লে কোনো কাজে, কোনো আনন্দে, কোনো সার্থকতায় আর-একজনের চলবে না, দু'জনের মনে-মনে এই রইলো গোপন, গম্ভীর প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু ছেলেবেলাকার বন্ধুতা—তা গভীর হয়, অন্তরঙ্গ হয়, পারস্পরিক নিঃশেষিত আত্ম-সমর্পণে উচ্ছ্বসিত হয়; কিন্তু স্থায়ী হয় না, হ'তে পারে না, বয়েস বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। কারণ, শৈশবে আমাদের বিচার-বুদ্ধি হয় না, কা'র সঙ্গে নিজকে ঠিক মানাবে, বোঝবার ক্ষমতা হয় না; তা ছাড়া, মনটা থাকে নরম, হাতের কাছে যা'কে পাওয়া যায়, তা'কেই ভালো লাগে, মন তা'র জন্যই পাগল হ'য়ে ওঠে। খুব সহজেই তখন ভালোবাসা যায়; মনটা ভালোবাসবার জন্যে তৈরিই হ'য়ে থাকে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য পেলেই হ'লো। যা'র চরিত্রের যেটা বিশেষত্ব, সেগুলো থাকে চাপা; খোঁচা-খোঁচা হ'য়ে কোথাও কিছু ফুটে নেই; দু'জন মানুষ, তাই, অনায়াসে পরস্পরের মধ্যে মিশে যেতে পারে, কোনোখানে এতটুকু আটকায় না। কিন্তু যৌবনের সূচনার সঙ্গে-সঙ্গে—যখন আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকশিত হ'য়ে উঠতে থাকে—তখন দেখা যায়, বালক-কালের সব বন্ধুতাই ভুল হ'য়ে গিয়েছিলো, সদ্য-জাগ্রত প্রকৃত নিজত্বের আলোয় সেই সব পরম, পরম অন্তরঙ্গদেরকে কী হাস্যকর, কী অসম্ভব মনে হয়! ভেবে অবাক লাগে, ওদের সঙ্গে কী করে' কখনো মিশতে পেরেছিলাম। এবং তাদের সম্বন্ধে শুধু এই আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে—আর যেন কখনো তাদের সঙ্গে দেখা না হয়। কারণ, দেখা হ'লে ব্যাপারটা এমন বিশ্রী হয়—এমন অস্বস্তিকর; এমন কি,

লজ্জাকর। লজ্জা হয়, পুরোনো বন্ধুতার মর্য্যাদা রাখতে পারছি নে বলে'; এই স্বল্পবুদ্ধি, বাজে চালিয়াৎ গোছের ছোকরার সঙ্গে কখনো অন্তরঙ্গ ছিলুম, এ-কথা মনে করে'। (এবং এ-ধারণা উভয়ত, সন্দেহ নেই; আমার 'বন্ধু'ও আমার সম্বন্ধে যা ভাবতে থাকে তা মোটেই সুশ্রাব্য নয়। না, এ-ধরণের পুনর্ম্মিলন না-হওয়াই ভালো, না-হওয়াই ভালো। আমরা দু'জনে দু'দিক দিয়ে বেড়ে উঠেছি, আমাদের চরিত্রের জন্ম-গত বিরোধিতা এতদিনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে; বনিবনা হওয়া অসম্ভব।) বন্ধুতা স্থাপন করবার সব চেয়ে ভালো সময় হচ্ছে প্রথম যৌবন; যখন আত্ম-সচেতনার উন্মেষ হয়, অথচ মনটা যখনও কঠিন হ'য়ে ওঠে না; যখন আমাদের নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা হয়, অথচ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো তাদের মূল সজীবতা, উন্মুখতা হারিয়ে ফেলে না। তখন পর্য্যন্ত নানারকম সাংসারিক সংঘাতের ফলে আমরা সাবধানী, সতর্ক হ'য়ে উঠি নে; নিজের চারদিকে নিরাপদ আড়াল রচনা করতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি নে; নিশ্চিন্ত আত্ম-কেন্দ্রগততার সমতলভূমি থেকে অন্তরঙ্গতার দুর্গম, বিপজ্জনক, উন্মুক্ত শিখরে আরোহণ করতে ভয় পাই নে, কুণ্ঠা করি নে। সেই হচ্ছে বন্ধুতা করবার বয়েস, জীবনের সেই মধুরতম সময়; সেই সব বন্ধুতাই স্থায়ী হয়—এই পৃথিবীতে যদি কোনো জিনিসকে স্থায়ী বলা যায়। সেই সময়ে স্থাপিত বন্ধুতা নিয়েই বাকি জীবন কাটাতে

হয় ; কারণ, পরবর্ত্তী জীবনে আমরা সঙ্গী পাবো, সহকর্ম্মী পাবো ; স্ত্রী, পরিজন, অনুচর—এ সমস্তই পাবো ; কিন্তু বন্ধু সেই পুরোনো যা'রা ছিলো, তা'রাই থাকবে, না-হয় আদৌ থাকবে না। একটা বয়েস আছে, যার পরে আর নতুন বন্ধু করা যায় না। আমাদের মন তখন শক্ত হ'য়ে উঠেছে ; সন্দিহান, আত্মরক্ষাশীল হ'য়ে উঠেছে ; কোনো পরিচয়ই আর তখন নিবিড়তার রসে পেকে উঠতে পারে না ; একজন লোককে খুব ভালো লাগে, প্রচুর মেলা-মেশা করি তা'র সঙ্গে ; কিন্তু একটা জায়গায় বাধা থেকেই যায়, সেখানে লেশমাত্র আক্রমণ হ'লে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রোধ করি—হ'তে পারে, সচেতনভাবে নয়, কিন্তু রোধ করি, ভয়ে নিজের মধ্যে নিজকে গুটিয়ে ফেলি ; প্রথম সূচনাতেই সে-সম্ভাবনাকে নষ্ট করে' দিই।

অনিবার্য্যরূপে, ভবভূতি আমার মন থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেলো। আমি বড় হ'য়ে উঠলাম, পৃথিবীর দিগন্ত হঠাৎ বহু দূর অবধি বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো ; দক্ষিণ-পক্ক দ্রাক্ষার মত, আমার নতুন যৌবনাক্রান্ত মনে রস-পীড়িত বন্ধুতা ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। তখন কোথায় বা গেলো ভবভূতি—আর কোথায় তা'র হাস্যকর, অসম্ভব সব পদ্য ! ওর সঙ্গে কখনো আবার দেখা হবে আশা করি নি ; কিন্তু ভাগ্যের উদ্দেশ্য ছিলো অন্যরকম। ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময় আমার জীবনে আবার ভবভূতির উদয় হ'লো। বয়েসে ও

আমার বছর দু'-একের বড় ছিলো ; দ্বিতীয় চেষ্টায় দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে' ভর্ত্তি হ'লো এসে ঠিক আমার বছরেই। আমাদের এত যত্নে করা সব প্ল্যান কবে ভণ্ডুল হ'য়ে, ধূলো হ'য়ে ঊনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে গিয়েছিলো, মনেও নেই ; কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে চলেছিলো অদৃষ্টের প্ল্যানহীন, উচ্ছৃঙ্খল অনিয়মিততা, তা'রই ফলে ভবভূতি আবার আমার সঙ্গে এসে জুটলো।

সত্যি কথাটা যদি বলতেই হবে, ভবভূতির মত ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করাবার চেষ্টা শুধু যে অর্থহীন, তা নয়, একাধিকভাবে ক্ষতিকর। সাধারণের চেয়েও নিম্নস্তরের বুদ্ধিতে অ্যাকাডেমিক বিদ্যা প্রবেশ করাবার চেষ্টা—তা এতই নিষ্ফল যে তা হাসিরও উদ্রেক করে না। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আমাদের দেশের সাংঘাতিকতম কুসংস্কারের মধ্যে একটা। কত কষ্ট, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করে' কোনো-কোনো বাপ-মা ছেলেকে (তাও এমন ছেলেকে, যে-কোনোরকম শিক্ষা গ্রহণ করতে যে জন্ম থেকে অক্ষম) 'শিক্ষিত' করবার অদম্য প্রয়াসে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে যান, তা দেখলে মর্ম্মাহত হ'তে হয়। শাদা যুক্তি দিয়ে বিচার করলে, ভবভূতিকে কলেজে ভর্ত্তি করানো তা'র বাবার পক্ষে নিছক বোকামি ছাড়া আর-কিছুই মনে হবে না ; তাঁর একমাত্র কর্ত্তব্য ছিলো, একটা সুযোগ পেলেই তা'কে যে-কোনো একটা

কাজে ঢুকিয়ে দেয়া; তা'তে অর্থ ও সময় দু'য়েরই ব্যয়সঙ্কোচ হ'তো। কিন্তু এটাও কিছু কম সত্য নয় যে একটা জিনিসকে সব সময় শাদা যুক্তি দিয়ে দেখা যায় না, আশার মায়াবী আলো দৃষ্টিকে তোলে রঙিন করে'। ভবভূতির বাবার নিজের জীবনে যে-সব আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছিলো, তিনি আশা করেছিলেন, দুরাশা করেছিলেন, ছেলেকে দিয়ে সেগুলোর পরিপূর্ণতা সাধন করবেন। বিদ্যার উপর ভদ্রলোকের একটা অমানুষিক সম্ভ্রম ছিলো—সেটা কুসংস্কারেরই সামিল। ঢাকায় তাঁর এক পিস্তুতো শালা ওকালতি করতেন, বেশ সচ্ছল তাঁর অবস্থা। তাঁর বাসায় থেকে ভবভূতি কলেজে পড়বে—এইরূপ ব্যবস্থা হ'লো। পৃথিবী পরিচালনায় যদি লেশমাত্র ন্যায়জ্ঞান থাকতো, তা হ'লে ওর বাবার আন্তরিক ইচ্ছার জোরেই ভবভূতি বিদ্যা-বিষয়ে কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব অর্জন করতো। কিন্তু সত্যি-সত্যি ব্যাপার যেমন···

যা-ই হোক, আশাতীত, অবাঞ্ছিত, ভবভূতি আমার জীবনে পুনঃপ্রবেশ করলে। কলেজের দুর্বিষহ অবসরের ঘণ্টায় একদিন কমন-রূমে বসে' পাঞ্চ্ পত্রিকার রসিকতা পড়ে' হাসবার চেষ্টা করছি, অনুভব করলাম, উল্টো দিকের একটা চেয়ার থেকে এক জনের দৃষ্টি বারে-বারেই আমার উপর নিবদ্ধ হচ্ছে। চোখ তুলতেই—মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধা করা সম্ভব ছিলো না—আমার বন্ধু ভবভূতিকে দেখলাম। আমার মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে গেলো, 'আরে!'

ভবভূতি উঠে আমার পাশে এসে বসলো। ও দাঁড়াতে লক্ষ্য করলাম, ও প্রকাণ্ড ঢ্যাঙা হ'য়ে গেছে। কিন্তু ওর চোখে সেই অসহায়, কাতর দৃষ্টি; তা'র ওপর, প্রথম যৌবনোন্মেষের ফলে ওর চলাফেরায়, ধরণ-ধারণে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব, একটু বিসদৃশতা—নিজের সম্বন্ধে ও যেন অতিরিক্তরূপে, কষ্টকররূপে সচেতন। ওর রোগা (কারণ রোগা ও প্রায় আগের মতই আছে), লম্বা শরীর মূর্ত্তিমান একটা অ্যাপলজির মত—এমন বিনীত, সঙ্কুচিত, সন্ত্রস্ত; কোনো ভঙ্গীতে বা আচরণে অন্যকে চটাবার ভয় সব সময় ওকে হানা দিচ্ছে; এবং ভয় পেয়ে ঠিক এমন-সব কাণ্ড করে' ফেলছে, যা'তে লোকে চটতে পারে। নাকের নিচে ওর গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট, পুরু হ'য়েই ফুটে উঠেছে; লক্ষ্য করে' দেখলে থুত্‌নিতে দু'এক গাছা দাড়িও চোখে পড়ে। মাথার চুল ঘাড় আর কান বেয়ে ঝুলে পড়েছে, তা'তে যথেষ্ট তৈল-প্রয়োগান্তে টেড়ি করবার প্রশংসনীয় চেষ্টার চিহ্ন বিরাজমান। গায়ে একটা আধ-ময়লা ছিটের শার্ট; তা'র গলার বোতামটা আটকানো, কিন্তু বুকেরটা অনুপস্থিত থেকে মাঝে-মাঝে বক্ষোস্থলে সদ্য-বিকাশোন্মুখ রোমরাজির আভাস দিচ্ছে। না, একবার ওর দিকে দৃষ্টিপাত করে' মুহূর্ত্তের জন্যও আমার পক্ষে দ্বিধা করা সম্ভব ছিলো না।

ভবভূতি মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে দেখে কী যে খুসি হ'লাম, রামতনু—'

আমি—খুব সোৎসাহে নয়—বললাম 'আমিও।'

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। পাঞ্চ্-এর একটা ছবির উপর দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করে' আমি ভাবতে লাগলাম, এর পরে কী বলা যায়? কী বলা যায়? আমার কপাল ভালো, তখনই ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে' আমি বললুম, 'একটা ক্লাশ আছে—আবার দেখা হবে।'

স্বীকার করবো, প্রথম থেকেই ভবভূতিকে আমি একটু দূরে-দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম; আভাসে-ইঙ্গিতে—এমন কি, অনেকটা স্পষ্টভাবে—তা'কে বুঝ্তে দিয়েছিলাম যে তা'র আর আমার মধ্যে যে-স্বাভাবিক ব্যবধান গড়ে' উঠেছে, তা অতিক্রম করতে আমি প্রস্তুত নই। অবিশ্যি অতিক্রম করা যে আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো, তা-ও নয়; যদি সে-চেষ্টা করতাম, তা'র ফল আমার পক্ষে হ'তো শুধু যন্ত্রণাদায়ক, এবং ভবভূতিও তা'তে খুব আরাম বোধ করতো না। সুতরাং, প্রথম থেকেই আমি সাবধান হয়েছিলাম। যে-পরিচয়কে বেশিদূর যেতে দেবার ইচ্ছে আপনার নেই, তা'কে প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়: না হ'লে একবার প্রশ্রয় দিয়ে ফেললে, পরে আর সামলানো যায় না। সূচনাতেই আমি রাশ টেনে দিয়েছিলাম, পরে যা'তে বিপদে পড়তে না হয়। আমার কোনো দোষ ছিলো না; ভবভূতিকেই বা কী দোষ দেবো? দোষ আমাদের মধ্যবর্ত্তী সময়ের। ভবভূতির সঙ্গে

আমার শেষ দেখা হবার পর হাওড়া পুলের নিচ দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে ; অনিবার্য্যরূপে, আমরা পরস্পরের অনেক, অনেক দূরে সরে' এসেছি। সময় যেখানে তা'র অদৃশ্য হাত দিয়ে জীবনের ছবির রঙ্ বদলে দিয়ে যায়, আমি সেখানে কী করবো ? অসম্ভব ছিলো, ভবভূতির সঙ্গে আমার ভাসা-ভাসা আলাপের বেশি কোনো সম্পর্ক থাকবে। যদি ছেলেবেলাকার বন্ধুতার খাতিরে, কর্ত্তব্যবোধ থেকে, জোর করে' আমি ওর সঙ্গে নিকটভাবে মিশতে যেতাম, তা হ'লে যেটুকু হৃদ্যতা ওর সঙ্গে ছিলো, তা-ও বজায় থাকতো না ; একদিন বাধ্য হ'তাম পাকা রকম ঝগড়া করতে। কোনো সন্দেহ নেই, তা'র চেয়ে এ-ই ভালো হয়েছে—এই ঈষদুষ্ণ, উত্তেজনাহীন পরিচয়। আর, ভবভূতিও এর বেশি কিছু চায় নি, আশা করে নি ; এর বেশি কিছু পেলেই ও বিব্রত হ'য়ে পড়তো ! আমার প্রতি ওর বালক-কালের অ্যাডোরেশন নতুন উৎসাহে জেগে উঠলো ; নিঃশব্দে, শান্তভাবে, অলক্ষিতে ও আমার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলো ; আঠার মত আটকে রইলো। অবিশ্যি আমার তা'তে কোনো ক্ষতি হ'তো না ; ভবভূতি ছিলো সেই জাতের মানুষ, যাদের উপস্থিতি স্বচ্ছন্দে ভুলে' থাকা যায়। ও বিরক্ত করতো না, কাজে বাধা দিতো না ; ও কাছে থাকলেও অনায়াসে নিজের কাজ বা অন্য কারো সঙ্গে গল্প করা যেতো ; নিজকে লুপ্ত করে' দেবার ক্ষমতা ছিলো ওর অসাধারণ, তা ছাড়া

কাছে ও বেশি থাকতোই না ; ওর অ্যাডোরেশন প্রধানত ছিলো দূর থেকে। কোনোদিক দিয়েই যে ভবভূতিতে বিশেষ-কিছু এসে যেতো তা নয়।

সেই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আমি একটু-একটু পরিচিত হ'তে আরম্ভ করেছি। এবং তা নিয়ে ভবভূতির কী উল্লাস ; ওর ম্লান মুখে, চোখের ভীত দৃষ্টিতে কী আশ্চর্য্য দীপ্তির বিদ্যুৎ-স্ফুরণ! ওর আনন্দ দেখে তখনকার মত আমারও যেন একটু আনন্দ হ'তো— কোনো এক নব্য মাসিকপত্রের আমি নিয়মিত লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভূত, ভবভূতির চোখে ভয়ানক এই ব্যাপার। 'আমি জানতুম, আমি আগাগোড়াই জানতুম, রামতনু, যে তুমি ভয়ানক একটা-কিছু হবে।' 'দেখেছো রামতনু, এ-মাসের অরুণোদয় তোমার কবিতা সম্বন্ধে কী লিখেছে?' 'ক্ষণপ্রভার সাহিত্য-সমালোচনা পড়েছো? মাথা-খারাপ না হ'লে কেউ অমন গায়ে পড়ে' ঝগড়া করে!' ভবভূতির স্তুতিতে কুণ্ঠা ছিলো না, শ্রান্তি ছিলো না, বিচার-বোধ ছিলো না, মাত্রাজ্ঞান ছিলো না। আমার তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির এই অতিরঞ্জিত, হাস্যকর মূল্যীকরণে প্রত্যেক মানুষের যে-মজ্জাগত ভ্যানিটি আছে, সেখানে আমারও যে একটু কণ্ডূয়ন না হ'তো তা নয় ; কিন্তু তা হ'লেও ভবভূতির উচ্ছ্বাস শুনতে-শুনতে ক্লান্তিবোধ না করে' পারতাম না। কারণ, ভবভূতির ছিলো সেই বিকৃত ক্ষমতা, যা'তে নিজের প্রশংসার মত

প্রীতিকর বিষয়ও ওর মুখ থেকে শুনলে অসহ্য লাগতো। আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতুম, অন্যদিকে তাকিয়ে হাই গোপন করতুম, চেষ্টা করতুম প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করতে; কিন্তু ভবভূতি তা'র করুণ, অসহায় ধরণে আঁকড়ে ধরে' থাকতো, আঠার মত আটকে থাকতো; সাহিত্য-বিষয় থেকে ওকে স্খলিত করা সম্ভব হ'তো না। ও যেন আমার ভিতর দিয়ে ওর অপরিপূর্ণ—এবং অপূরণীয়—খ্যাতি-লিপ্সাকে চরিতার্থ করতো; পরোক্ষে, বিচিত্র সম্ভাবনায় উজ্জ্বল সাহিত্যিক জীবন বাঁচতো। আমার তা-ই মনে হয়েছিলো। অন্তত প্রথমটায়। কিন্তু কিছুদিন যেতেই টের পেলুম যে ভবভূতির একটা নিজস্ব—হোক তা অতি গোপন, কৌমার্য্যের লজ্জা-জড়িত—উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে; বাল্যকালে তা'র মনে যে-বীজ সঞ্চারিত হয়েছিলো—সে-অপরাধ আমার, আমার!—এখন পর্য্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ে সে তা লালন করে' এসেছে। একটু বিস্মিতই হ'লাম। সত্যি বলতে, ভবভূতির কাছ থেকে এতটা আশা করি নি।

কী কঠিন চেষ্টায় তা'র প্রবল লজ্জা জয় করে' ভবভূতি আমাকে তা'র ইদানীকার কাব্য-প্রচেষ্টা দেখিয়েছিলো, তা আমি সহজেই বুঝতে পারি। অনেকক্ষণ ধরে'ই সে এ-কথা ও-কথায় ভূমিকার অবতারণা করছিলো; ব্যাপারটা তা'র পক্ষে একটু সহজ করবার জন্যে আমি বলেছিলাম, 'তুমি আজকাল আর লেখো না?'

'না—না, আমি আর কী লিখবো—না, আমি—হ্যাঁ, এই একটু-আধটু—' ভবভূতি এলোমেলো ভাবে কথাটা অসমাপ্ত রাখলো।

তখন আমার বলা কর্ত্তব্য হ'লো: 'আমাকে দু'-একটা দেখালেও তো পারো।'

অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলুম, ভবভূতির জামার বুক-পকেট কাগজের তাড়ায় উঁচু হ'য়ে আছে। কাগজগুলো যে কী, তা-ও আমার বুঝতে বাকি ছিলো না। এইবার—শীতের সকালে লোকে যেমন করে' পুকুরে ঝাঁপ দেয়, তেমনি, চোখ-মুখ বুজে, দাঁতে-দাঁত লাগিয়ে ভবভূতি তা'র বুক-পকেটস্থ কাব্য-ভাণ্ডার আমার সামনে উজাড় করে' দিলে। আমি একটা পড়লাম, দুটো পড়লাম, তারপর বললাম, 'হুঁ।'

কাগজের দিকে তাকিয়েও আমি বুঝতে পারছিলাম, ভবভূতি রুদ্ধশ্বাসে, অনিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এইবার ঢোঁক গিলে বলে' উঠলো, 'কেমন?'

আমি অম্লানমুখে—কারণ সেটাই সব চেয়ে সহজ ছিলো—বললাম, 'চমৎকার।'

'না—সত্যি বলো।' উৎকণ্ঠায়, আনন্দে ওর গলা কেঁপে গেলো।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'সত্যি বলছি।'

সঙ্গে-সঙ্গে ভবভূতির সমস্ত মুখে-চোখে এমন-এক আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটলো যে এই নির্লজ্জ মিথ্যা-ভাষণের জন্য নিজকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। এই দুঃখের সংসারে, তখন আমার মনে হয়েছিলো, এতখানি আনন্দ আনবার ক্ষমতা যদি একটা মিথ্যার থাকে—কিন্তু আমার ভুল হয়েছিলো ; তখনও বিচার করবার সময় হয় নি।

তা'র পর থেকে ভবভূতি প্রায়ই আমাকে দেখাবার জন্য তা'র পদ্য নিয়ে আসতো—একটা নয়, দুটো নয় ; রাশি-রাশি, অজস্র—শরতের সকালে ঝরে'-পড়া শেফালির মত, বর্ষায় গ্রামের পুকুরে কচুরি-পানার মত অগুন্তি। রুল-টানা, মসৃণ কাগজে কোণবহুল হস্তাক্ষরে লেখা তা'র সব পদ্য—ও যে ধৈর্য্য ধরে' অত লিখতে পারতো সেই জন্যেই ওকে প্রশংসা করতে হয়। শুধু অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত লিখে যাবার ক্ষমতা যদি কাব্য-বিচারের একটা মান হ'তো, ভবভূতির আসন তা হ'লে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অনেক উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'তো, সন্দেহ নেই। ওর সঙ্গে আমার যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তা'র পর থেকে এই ক'বছর ও অবিচলভাবে কবিতার পিছনে লেগে রয়েছে, অবিশ্রান্ত লিখে-লিখে—একদিন ও আমার কাছে স্বীকার করে' ফেললো—ছোট একটা পোর্ট্-ম্যাণ্টোয় ভরে' রেখেছে ; মাঝে-মাঝে বা'র করে' নিজেই সেগুলো পড়েছে। অন্যকে পড়াবার ইচ্ছে যে ওর না ছিলো, তা নয় ; মানুষমাত্রেরই সে ইচ্ছে হ'য়ে থাকে। সে-উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাময়িক-

পত্রে ও বার-বার কবিতা পাঠিয়েছে ; বেশির ভাগ ফেরৎ এসেছে, কোনোখান থেকে বা ফেরৎও আসে নি। মোট কথা, এ-পর্য্যন্ত একটা লেখাও প্রকাশ করতে ভবভূতি সক্ষম হয় নি। কিন্তু তা'তে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হ'য়ে ও আরো লিখতে বসে' গেছে। এমন অধ্যবসায়, এমন অবিচল নিষ্ঠা বাঙালি জাতে বিরল।

বাঙ্‌লাদেশের সাময়িকপত্র সাধারণত পদ্য একটু চলনসই হ'লেই ছাপে, এবং তা দুটো কারণে। প্রথমত, তা'র জন্যে পয়সা দিতে হয় না ; এবং, বাড়তি স্থান-পূরণের উপায়-হিসেবে পদ্যের মত কিছু নেই। এই অবস্থাতেও, কোনো পত্রিকাই যখন ভবভূতির কোনো রচনাকেই স্থান দিতে স্বীকৃত হয় নি, এ থেকেই বোঝা যায়, ওর পদ্য কী-শ্রেণীর। অবিশ্যি, ভবভূতির কাছে যা মনে হ'তো সম্পাদকদের অন্ধ অবিচার, তা নিয়ে ওর মনে একটু আক্ষেপ ছিলো। স্বভাবতই। সেটা মোটেও পরিস্ফুট নয়, কিন্তু টের পাওয়া যেতো। মাঝে-মাঝে ও আমাকে এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো, 'তোমার কি মনে হয়, রামতনু, আমার কোনো কবিতা ছাপা যেতে পারে ?'

'আমাদের সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায়', গম্ভীরমুখে আমি হয়-তো বলতুম, 'নয়।'

'নয় !' ভবভূতির মুখ শুকিয়ে যেতো।

'না। কারণ তোমার কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করবার মত সূক্ষ্ম

রসবোধ এ-দেশে এখন পর্য্যন্ত খুব কম লোকেরই হয়েছে। কে বুঝবে তোমার লেখা ? তুমি তো আর সাধারণ, জল-ভাত গোছের লেখক নও, যা'র লেখা যে-কোনো লোক পড়ে'ই বুঝে ফেলতে পারে। বিশেষ, কাগজের সব সম্পাদক—তাদের মাথায় কি কিছু আছে ? আমি যদি তুমি হতুম, আমি তো কক্ষনো কোথাও লেখা পাঠাতুম না। এত ভালো যে লেখে, তা'র আবার ভাবনা কী ?'

'কাগজের সম্পাদকরা', আমার কথাগুলো উগ্র মদের মত ভবভূতির সাহস বাড়িয়ে দিতো, 'একটু যেন কেমন—না ? যে-সব লেখা আসে, হয়-তো না-পড়ে'ই বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে' দেন্ ? হয়-তো বিশেষ কয়েকজন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাইরে কারো লেখা নেন্ই না ?'

'আর বোলো না ও-কথা। কাগজের আপিসের ব্যাপার সবই তো জানি! এক-এক জায়গায় এক-এক দল ঘোঁট পাকিয়ে বসে' আছে—বাইরের কাউকে ঢুকতে দিতে কি চায় !'

'হুঁ।···আচ্ছা, তোমার তো কোনো-কোনো কাগজে জানা-শোনা আছে। তুমি চেষ্টা করলে পারো না—'

'চেষ্টা ! তোমার কবিতার জন্য চেষ্টা করতে হবে কেন ? সেটাই যে তোমার পক্ষে অপমান। লোকে তোমাকে লুফে নেবে, তোমার পায়ে ধরে' সাধাসাধি করবে। তুমি তো আর দু'-একদিনের শস্তা খ্যাতির জন্য হাত পাততে যাবে না। তুমি যা

লিখছো, তা যে চিরকাল থাকবে। তখন—আজকাল যা'রা খুব আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম করছে, কোথায় থাকবে তা'রা? সম্প্রতি, লেখা ছাপা হওয়া আর না-হওয়া—কী এসে যায় তা'তে? তুমি যদি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে' থাকো, তা হ'লেই বা তোমাকে আটকাবে কে? সময়ের বিচারে জয় তোমার হবেই।'

এ-সব কথা বলতাম; কিন্তু নিশ্চিত অমরত্বের আশ্বাসেও ভবভূতির মন সম্পূর্ণ সান্ত্বনা মানতো বলে' মনে হ'তো না। আশু-লভ্য খ্যাতির অসারতা সম্বন্ধে তা'কে বোঝাতে বাকি রাখি নি; তবু মাসিকপত্রে কবিতা ছাপানোর লোভ সে কিছুতেই গোপন করতে পারতো না। আমার পরিচিত যা দু'একটা নব্য কাগজ তখন ছিলো, সেখানে তা'র লেখা পাঠাতে স্পষ্টভাবে কি প্রকারান্তরে একটু সুযোগ পেলেই আমাকে অনুরোধ করতে তা'র ভুল হ'তো না; নানা অছিলায় আমি সে-সব এড়িয়ে যেতাম। শেষ পর্য্যন্ত—এক বছর কলেজ-ম্যাগাজিনের ভার ছিলো আমার উপর; কলেজ-ম্যাগাজিনগুলোর যা হাল হ'য়ে থাকে, ভবভূতির পদ্যের মত লেখাও তা'র কোন ক্ষতি করতে পারে না; সুতরাং সেখানে অপরিবর্ত্তিত, বিশুদ্ধ অবস্থায় দিলাম ওর এক পদ্য ঢুকিয়ে। (বদলাতে গেলে নতুন করে' লিখতে হ'তো তাই সে-চেষ্টাও করলাম না।) ভবভূতির সমস্ত জীবনের পর্ব্বত-প্রমাণ সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে ঐ একটিমাত্র লেখা ছাপার অক্ষরে বিদ্যমান।

ভবভূতিকে আমি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে তা'র লেখা হচ্ছে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর, এবং সেই জন্যই—যেমন চিরকাল হ'য়ে এসেছে—সাধারণের সমাদর পেতে তা'র দেরি হচ্ছে। তবে সেটা আসবে—অনিবার্য্যরূপে, যেদিনই এবং যে-ভাবেই হোক। এবং তখন—আজকের বাজারে লোকের চাহিদা অনুসারে খেলো জিনিস তৈরি করে' যা'রা নাম কিনছে—কোথায় থাকবে তা'রা? মুখে প্রকাশ না করলেও, এই ধারণা যে ওর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, তা আমি বুঝতে পারতাম। আমার দিক থেকে এ-আচরণ অসঙ্গত, অন্যায়—এমন কি, একটু হীন—মনে হ'তে পারে। ঠিকই, মাঝে-মাঝে সে-কথা মনে করে' আমার লজ্জা হয়, তা'র বেশি দুঃখ হয়। কিন্তু তখন—ওকে নিয়ে মজা করবার জন্য যে আমি ও-সব কথা বলতুম, তা নয়। এ ছাড়া আর কোন্ কথা বলে' ওকে সান্ত্বনা দেয়া যেতো? সত্যি যেটা, তা বললে বড় নিষ্ঠুর হ'তো, বড় বেশি নিষ্ঠুর হ'তো। খামকা একজন নিরীহ, নির্দ্দোষ লোকের মনে কষ্ট দিয়ে সত্যবাদিতার গৌরবে উল্লসিত হওয়া—তা'র আমি কোনো সার্থকতা দেখি নে। অবিশ্যি অতদূর না গিয়ে মোলায়েম করে' বলা যেতো, ওকে বুঝিয়ে দেয়া যেতো—কিন্তু মুখে আমি যা বলি, ও তা-ই একেবারে বিশ্বাস করে' ফেলবে, ওর বুদ্ধি যে এতই কম, তা আমি মনে করতে পারি নি। ও যে ও-সব কথা বিশ্বাস করতে পেরেছিলো,

তা'তেই প্রমাণ হয় যে যে-কোনো অবস্থাতেই ও অসম্ভব আত্ম-বঞ্চনা অভ্যেস করতে পারতো।

এখানে কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে যাচ্ছি; কারণ এই সময়ে ভবভূতি দ্বিতীয়বার আমার দিগন্ত থেকে অন্তর্হিত হ'লো। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে' আমি এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হ'লাম, আর ভবভূতি পরীক্ষায় ফেল করে' কোথায় যে মিলিয়ে গেলো, তা'র আর কোনো দিশে পাওয়া গেলো না। ভবভূতি এমন লোক নয়, যা'র অভাব কেউ কখনো অনুভব করতে পারে; সুতরাং ওর দিশে পাবার আমি কোনো চেষ্টা করলাম না। চেষ্টা করলেও যে পেতাম, তা নয়। ও অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, স্রেফ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। পাঁচ বছর পরে এক সন্ধ্যায় হ'লো ওর পুনরাবির্ভাব—কলকাতায় এক বাস্-এর মাথায়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে আমার পাশে একজন এসে বসলো, টের পেয়েছিলুম; কিন্তু রাস্তার দিকেই তাকিয়ে যেতে লাগলুম; বাস্-এ যেতে-যেতে যে-কেউ আপনার পাশে এসে বসে, তা'রই মুখের দিকে তাকাবার কথা আপনার মনে হয় না। কিন্তু সেই পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি যদি আপনাকে নাম ধরে' ডাকে, আপনি চমকে ফিরে তাকান; এবং রীতিমত একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েন, যখন দেখতে পান, এমন একজন লোক আপনার পাশে বসে' আছে, এই পৃথিবীতে যা'র অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আপনি বছরের পর বছর সম্পূর্ণ নিশ্চেতন ছিলেন।

ভবভূতির গালে তিনদিনের দাড়ি, মুখে-চোখে এক সম্পূর্ণ দীর্ঘ দিনের মস্তিষ্কহীন, যান্ত্রিক কাজের ক্লান্তি। তা'র চুলের ভাগ-রেখা—লক্ষ্য করলুম—এতদিনে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় হয়েছে; তৈলাক্ত, সুবিন্যস্ত মাথায় সমস্ত দিন আপিস করবার পরও একটি চুল এদিক-ওদিক নয়। তা'র মলিন শার্টের বোতামগুলো এখন ঠিকই আছে। প্রায় তেমনি রোগা, পাঁচ বছর আগে তা'কে যেমন দেখেছিলুম; সমস্ত শরীরের মধ্যে শুধু মুখের উপর সময়ের চিহ্ন পড়েছে—প্রথম যৌবনের তীক্ষ্ণ আত্ম-সচেতনতা-প্রসূত অস্বস্তির ভাব কেটে গিয়ে এখন তা সাবালকতায় স্বচ্ছন্দ, আত্মস্থ হয়েছে। না—তা'রও বেশি: সে-মুখ পরিপক্ক, অতিরিক্ত পরিপক্ক; অকাল-প্রৌঢ়ত্বের ছায়ায় সে-মুখ স্থবির, অনেকটা ব্যঞ্জনা-হীন হ'য়ে পড়েছে। ওর চোখের ভীত, অসহায় দৃষ্টি এখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন।

পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সাধারণ কুশল-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হ'লাম। অনিচ্ছায়, ছাড়া-ছাড়া-ভাবে ও নিজের কথা বললে—অবিশ্যি বলবারই বা কী ছিলো; ও যে এখন সওদাগরি আপিসের কেরানি, ওকে দেখে তা বলবার জন্য শার্লক হোম্‌স্‌-এর দরকার করে না। একবার ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করে' ওর পক্ষে আর দ্বিতীয় চেষ্টা করা সম্ভব হয় নি; ওকে শিক্ষা-দান করতে ওর বাবার এমন যে উৎসাহ, তা-ও মিইয়ে এসেছিলো। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন

এ-সত্যটা স্বীকার করতে যে—যতই না তিনি চেষ্টা করুন—তাঁর জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এ-ছেলেকে দিয়ে পরিপূর্ণ হবার নয়। অপ্রিয়, নিষ্ঠুর সত্য—কিন্তু এর হাত থেকে নিস্তার কোথায়? কত লোক তো নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্মে' পৃথিবীতে তাদের নাম রেখে যায়—তাঁর ছেলে কেন ও-রকম হ'লো না? কেন? কেন? আশায়-আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত আমরা মানুষ প্রশ্ন করি—ব্যর্থতায়, বিদ্রোহে, অনুসন্ধিৎসায় প্রশ্ন করি: সমস্ত বিশ্ব নিরুত্তর। কেন যে তাঁর এত আশার ছেলে—আর-কিছু না হোক, অন্তত কৃতবিদ্য, অর্থশালী হবে না, নিজের জীবনে ব্যর্থ সেই বৃদ্ধ এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পান নি। কিন্তু সত্যকে এড়ানো গেলো না; পুত্রের জন্য বিদ্যার অনুধাবনে তিনি ক্ষান্ত হ'লেন। ভবভূতির কপাল ভালো—ঠিক সময়ে তা'র একটা চাকরিও জুটে গেলো। ঢুকেছিলো পঁয়ত্রিশ টাকায়; এখন হয়েছে চল্লিশ। গেলো বছর, ছেলেকে তা'র চরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখে ভব-ভূতির বাবা মারা গেছেন। এখন, বিধবা মা আর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে (চাকরি পেয়েই ভবভূতি বিয়ে করেছিলো) ও দর্জিপাড়ায় এক বাড়ি ভাড়া করে' আছে। সংসারে দুঃখ-কষ্ট, আপদ-ঝঞ্ঝাট আমাদের সকলেরই আছে; ওর ভাগ্যেও তা'র অংশ জুটছে! ইচ্ছে করলে অবিশ্যি ওর জীবন নিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে এক স্যাঁৎসেঁতে দুঃখের গাথা রচনা করা যায়; কিন্তু সত্যি বলতে

গেলে, ও বেশ সুখেই আছে ; ওর জীবনের উচ্চতম যা সম্ভাবনা, তা সফল হয়েছে ; ওর জন্যে বিশেষরূপে দুঃখ করবার কী কারণ থাকতে পারে ? ভবভূতির জীবনে এর বেশি কী আর হ'তে পারতো ?

তবু, ওর সৌভাগ্যে মুখ ফুটে ওকে ঠিক অভিনন্দন করতে পারলাম না। বরং, ওর পাশে বসে' নিজের জন্য যেন লজ্জাবোধ করতে লাগলাম। জীবনের ভারে নুয়ে-পড়া, ক্লান্ত, বিক্ষত-যৌবন ওর পাশে আমার বেশের পরিচ্ছন্নতা, মনের প্রফুল্লতা, আমার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, নিশ্চিন্ত লঘুচিত্ততা—সব যেন ভাল্গার, অত্যন্ত ভাল্গার—এমন কি, একটু অশ্লীল—বোধ হ'তে লাগলো। ওর কথা শেষ হ'লে কী বলবো ভেবে না পেয়ে পকেট থেকে সিগ্রেট বা'র করে বললাম, 'খাও।'

'না, থাক।'

'খাও না ?'

'তা নয়—তবে, এখন থাক।'

'খাও না একটা।'

'আচ্ছা', একটু ইতস্তত করে' ভবভূতি বললে, 'দাও তবে একটা।' ঠোঁটের ওপর দু' আঙুল ঠেকিয়ে শব্দ করে' সিগ্রেটে টান দিয়ে বললে, 'তুমি তো আজকাল রীতিমত ফেমাস্ হ'য়ে পড়েছো—'

আমি তাড়াতাড়ি বলে' উঠলুম, 'পাগল—ফেমাস্ আর কী!'

নীরবে আমার মুখে একটু তাকিয়ে ভবভূতি জিজ্ঞেস করলে, 'সবসুদ্ধ ক'খানা বই হ'লো?'

যেন এটা মস্ত এক অপরাধের ব্যাপার, এই ভাবে, অস্পষ্টস্বরে আমি বললুম, 'এই—খান ছ'য়েক।'

'বেশ আছো, মনে হচ্ছে। —তা বেশ থাকবেই বা না কেন?'

'বেশ! হ্যাঁ, বেশই তো আছি!' কণ্ঠস্বরে আমি অতিরিক্ত আয়রনি প্রকাশ করে' ফেললুম, 'চাকরি-চাকরি করে' পাগল হ'য়ে গেলুম, তবু একটা জুটছে না।'

'কেন, তোমার আর চাকরির দরকার কী? বই লিখে টাকা পাও না?'

আমি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলুম।

'কোথায় যাচ্ছো এখন? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো মেয়ের কাছে যাচ্ছো।'

ওর অনুমান যে একেবারে ভুল হয়েছিলো, তা নয়; মৃদু হেসে আমি চুপ করে' রইলুম। একটু পরে, আমার পরিচ্ছন্ন বেশ, কেইস্-ভর্ত্তি সিগ্রেট, আমার সাহিত্যিক খ্যাতি, মুখের প্রশান্তি আর এই সন্ধ্যায় কোনো অস্পষ্ট, রহস্য-অতিরঞ্জিত মেয়ে-বন্ধুর

কাছে যাত্রার প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টায় আমি বললুম, 'বিয়ে করে' কেমন আছো?'

ভবভূতি আড়ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালে; প্রশ্নটা যেন ঠিক বুঝতে পারলে না।

'যা-ই বলো', প্রায়শ্চিত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আমি আবার বললুম, 'স্ত্রী থাকলে জীবনের রঙ্ই বদলে যায়।'

ভবভূতি মুহূর্ত্তকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললে, 'তুমি তা হ'লে বিয়ে করো নি কেন?'

'করবো', সঙ্গে-সঙ্গে আমি জবাব দিলুম। তা ছাড়া আর-কোনো জবাব দেয়া সম্ভব ছিলো না। আমি যদি বলতুম, বিয়ে করলে চলবে কী করে'—ক্লান্ত, বিবর্ণ ভবভূতির পাশে, তা'র নিষ্প্রভ, অসহায় দৃষ্টির নিচে বসে' সেটা নিছক বর্ব্বরতা হ'তো। ওর দাম্পত্য জীবন ওরই চোখে রঙিন করে' তোলবার জন্য আমার নিজেরই পরিণয়ে ঔৎসুক্য দেখানো ছাড়া উপায় ছিলো না। নিজের সুখীত্বে লজ্জিত, আমি চেষ্টা করতে লাগলুম ওকে ওর নিজের কাছে সুখী বলে' উপস্থাপিত করতে। তা'তে যেন আমার খানিকটা নৈতিক সমর্থন।

'কবে?'

'শিগগিরই', মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা না করে' আমি বললুম। বিবাহিত জীবনের পবিত্র আনন্দ সম্বন্ধে চেষ্টা করলুম মনকে ফেনিয়ে

তুলতে। খেলাটা আমার কাছে একটু মজার লাগতে আরম্ভ করেছিলো।

একটু চুপ করে' থেকে নিম্নস্বরে, কোনো গভীর, গোপন কথা জিজ্ঞেস করবার ধরণে ভবভূতি বললে, 'কা'কে ?'

'আছে একজন।' আমার কণ্ঠস্বর, আমার বলবার ভঙ্গী ইঙ্গিত করলে একটা আবেগ-ঘন রোমান্সের প্রতি। ভবভূতি যা শুনতে চায়, প্রাণ ধরে' তা না বলে' পারলুম না।

'কে সে ?' ভবভূতির ক্লান্তি-ধূসর, জীবন-রেখাঙ্কিত মুখ মুহূর্ত্তের জন্য কৌতূহলে দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

'আছে', এ ছাড়া কী বলা যায় আমি ভেবে পেলুম না। দপ্ করে' নিবে গেলো ওর মুখ: অবৈধ কৌতূহল প্রকাশ করে' ফেলবার জন্য ও যেন সমস্ত শরীর দিয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা করলে। মনে-মনে আমি বিব্রত হ'য়ে পড়লুম, দুঃখিত হলুম। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার স্ত্রী কেমন ?'

'কেমন আবার।'

'কেমন দেখতে ?'

'কী যেন।'

ওর কুণ্ঠা অপসারণ করবার চেষ্টায় আমি বললুম, 'বেশ ভালো—না ?'

'কী যেন', ভবভূতি এইবার একটা অদ্ভুত কথা বললে, 'ভালো করে' তাকিয়ে দেখি নি।'

কথাটা হাতুড়ির বাড়ির মত আমার মনের উপর এসে পড়লো। ভবভূতিকে প্রেমিকরূপে কল্পনা করা সোজা নয়; হৃদয়াবেগের তীব্রতায় ও আলোড়িত, উন্মথিত হচ্ছে, এমনতরো দুরাশা না-করবার জন্য অসাধারণ বিচক্ষণ হ'তে হয় না, কিন্তু তাই বলে' এই! ভালো করে' তাকিয়ে দেখি নি! এই অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় উদাসীনতায়, মূঢ়তায়, আত্মার এই মৃতত্বে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। আর যা-ই হোক, মনে-মনে আশা করবার সাহস আমার হয়েছিলো, আর যা-ই হোক, যৌবনের একটা স্বধর্ম্ম তো আছে—পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা, দিন থেকে দিনে নিরবচ্ছিন্ন আত্মবিলোপকারী দীনতা অতিক্রম করে' একটা জায়গায়, কোনো-একটা জায়গায় যৌবন নিশ্চয়ই ঝলসে উঠবে তরবারির মত দীপ্ত। আমি চেয়েছিলুম সেই জ্যোতিরপভ্রংশ উন্মোচন করতে, প্রাত্যহিক তুচ্ছতারাশিতে শূন্যীকৃত এই ভবভূতির অন্তরের সেই সঙ্গোপনতায় প্রবেশ করতে, যেখানে কেবল তা'র যৌবনেরই জোরে সে রাজা। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিলো: ভবভূতির যৌবন—তা শুধু একটা ঐতিহাসিক তথ্য, তা'র বেশি কিছু নয়। সে সেই দুর্ভাগাদের একজন, যা'রা জাতবৃদ্ধ—যা'রা কখনো, এক মুহূর্ত্তের জন্যও জ্বলে' ওঠে না, আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে না ক্ষণিক বসন্তে—একবারের

জন্যেও অন্যায় করবার দেব-অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয় না, নিজকে কল্পনা করে না দেবতা বলে'। প্রথম যৌবনে ওকে আমি দেখেছিলুম ; সেই একটা সময়—সমস্ত স্বর্গ যখন মানুষের আত্মায় পুষ্পিত হ'য়ে ওঠে—তখনও ভবভূতি ওর দীনতার, নগণ্যতার স্তূপে আত্ম-অপসৃত। আমার বোঝা উচিত ছিলো, আঠারো বছর বয়েসেও যে-মানুষ নিজকে একবার ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে পারলে না, তা'র মত দুর্ভাগা কেউ নেই।

কিন্তু তখনও আমার জানতে বাকি ছিলো যে যে-ভবভূতি তা'র স্ত্রীর দিকে কখনো ভালো করে' তাকিয়ে দ্যাখে নি, সে-ও—সে-ও কল্পনা করছে—অর্দ্ধ-অচেতন নির্ব্বুদ্ধিতার আচ্ছাদনে ধিকি-ধিকি জ্বলছে তা'র কল্পনা—স্বপ্ন দেখছে এক জ্যোতির্ম্ময় অমরত্বর, সাহিত্য-অমরাবতীর কালাতীত, চিরন্তন দেবত্বের। কিন্তু তা'র মূলে যৌবনের প্রেরণা নয়, তা উৎসারিত নয় প্রাণশক্তির অদম্য আগ্রহ থেকে। তা একটা অবিচল, অন্ধ ধারণা—আত্মার একটা সর্ব্বনেশে ক্ষয়রোগ; ভবভূতির আত্মাকে ব্যাধির মত তা হানা দিচ্ছে, তা তা'কে পেয়ে বসেছে নির্ম্মমভাবে, দিন থেকে দিন ভবভূতিকে জীর্ণ করে' নিচ্ছে নিজের মধ্যে।

কথাটাকে অন্যরকম মোচড় দিয়ে মুখে আমি বললুম, 'যা'কে ভালোবাসা যায় তা'কে কি যথেষ্ট করে' দেখা যায় কখনো ?'

ভবভূতি ফ্যালফ্যাল করে' সামনের আসনে উপবিষ্ট একটি

লোকের ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি ঈষৎ লজ্জিত বোধ করলুম। কথাটা এমন অবান্তর, অসঙ্গত শোনালো: স্থূল, বিকৃতরুচি কোনো রসিকতার মত।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর গাড়ি যখন কলেজ ষ্ট্রীটে পড়েছে, ভবভূতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করলে, 'আচ্ছা, রামতনু—' এইটুকু বলে'ই থেমে গেলো।

'কী, বলো', আমি চোখে-মুখে যথাসাধ্য উৎসাহ ফুটিয়ে তুললুম।

'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে—তোমার সঙ্গে তো অনেক প্রকাশকের জানাশোনা আছে—না?'

চমকে উঠলুম। একটা উৎকট সন্দেহ আকস্মিক শ্বেত বিদ্যুতের মত সমস্ত মন দীর্ণ করে' দিয়ে গেলো। এ-ও কি সম্ভব? এ-ও কি সম্ভব যে বাল্যকালের এক অসাবধান মুহূর্তে যে-বিষ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিলো—সে-জন্য দায়ী আমি, আমি!—এখনো তা'র প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি? এমনও কি হ'তে পারে যে তা'র এই দৈনিক আট ঘণ্টা, তা'র সমস্ত অবয়বের এই নীরব ক্লান্তি, মুখের আলোহীন ধূসরতা—এই সব-কিছু সত্ত্বেও ভবভূতি এখনো—লেখে? যে-ভবভূতির তা'র স্ত্রীর মুখের দিকে ভালো করে' তাকিয়ে দেখবার সময় হয় না?

'না থেকে আর উপায় কী', ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম।

'তা হ'লে—তা হ'লে—আচ্ছা ধরো—' ভবভূতি হতাশভাবে কথাটা শেষ করবার আশা ছেড়ে দিলে।

আমি ওকে সাহয্য করলুম, 'কেন, তুমি কিছু লিখছো-টিকছো নাকি?'

'হ্যাঁ, লিখছি তো অনেকদিন ধরে'ই', তাড়াতাড়ি, রুদ্ধস্বরে, যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে ভবভূতি বলতে লাগলো, 'এখন—তোমাকে পেলুম—তুমি যদি দয়া করে' একটু দেখে দাও—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'তুমি বললে কেউ হয় তো একটা বই বা'র করতে রাজি হ'তে পারে?'

'সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।' কথাটা সত্যি, কিন্তু তা বলে'ই অনুতাপ হ'লো। ভবভূতির হয়-তো মনে হ'তে পারে, আমি তা'কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি, তা'কে সাহায্য করতে অস্বীকার করছি। পরের মুহূর্ত্তেই, তাই, কৌতূহল প্রকাশ করে' বললাম, 'তোমার বই শেষ হ'য়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী—উপন্যাস?'

'উপন্যাস। গল্পও আছে।'

'তোমার অনেক লেখা জমা আছে বুঝি?'

শীতের সকালে পুকুরে ঝাঁপ দেবার ধরণে ভবভূতি স্বীকার করে' ফেললে চার-পাঁচখানা বই হবার মত গল্প আর খান দশেক উপন্যাস তা'র বাক্সে জমা হ'য়ে আছে। এর ভিতর থেকে অন্তত একটা সে প্রকাশ করে' দেখতে চায়। প্রথমে সে কিছু টাকা চায় না; বই বা'র করে' দিলেই সে খুসি।

বজ্রাহত হ'য়ে আমি বললুম, 'সে কী! তুমি এত লিখেছো? সময় পাও কখন্?'

'সময় ইচ্ছে করলেই করে' নেয়া যায়। আপিস থেকে ফিরে রোজ কয়েক ঘণ্টা লিখি—রাত্তিরে ভাত খেয়ে আবার অনেক রাত পর্য্যন্ত।'

'রোজ?'

'প্রায় রোজই।'

'কী করে' পারো? ক্লান্ত লাগে না?'

'তা লাগে বই কি, কিন্তু না লিখেও পারি নে।'

মুগ্ধদৃষ্টিতে ভবভূতির মুখে তাকিয়ে আমি বলে' উঠলাম, 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ক্ষমতা তোমার।'

'আমার মনে হয় কী জানো, রামতনু', নিম্নস্বরে—পবিত্র, গোপন কথা বলার মত করে' ভবভূতি বললে, তা'র ম্লান, ক্লান্ত চোখ মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, 'মনে হয়, আমি যা লিখি, তা বোঝবার উপযুক্ত বাঙ্‌লাদেশ এখনো হয় নি। আমার সময়

যখন আসবে—তখন আসবে। সেই জন্যেই মুহূর্ত্তের জন্য আমি লেখা বন্ধ করে' দেবার কথা ভাবি নে।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' বলে' আমি উঠে দাঁড়ালাম ; আমার গন্তব্য স্থান এসে গিয়েছিলো।

'তা হ'লে—একদিন তোমার ওখানে যাবো, কী বলো ?'

'হ্যাঁ, যেয়ো।' আমি ওকে আমার ঠিকানা দিলাম।

'সামনের রোববার—কেমন ?'

'আচ্ছা।'

'আমার সময় যখন আসবে, তখন আসবে'—কথাগুলো আমার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। তাদেরকে চিনতে পারলুম আমারই কথা বলে'—অনেক বছর আগে, অসতর্কে, লঘুচিত্তে উচ্চারিত। কী হাস্যকর—ধূসর, গম্ভীর মুখে, ভুরু ঈষৎ উত্থিত করে' ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়ে শূন্যে একটা মৃদু টোকা দিয়ে ভবভূতি ও-কথা বলছে! না—ভবভূতির মুখে ও-স্পর্দ্ধার কথা হাস্যকর পর্য্যন্ত নয়। তা নিয়ে তামাসা করা পর্য্যন্ত যায় না। আমি, তা হ'লে, ওকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলুম যে ওর সাহিত্য এতই মহৎ যে তা'র জন্য আমাদের দেশ এখনো প্রস্তুত হ'তে পারে নি। ও সে-কথা যে শুধু বিশ্বাস করেছে তা নয়, এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে' সে-ধারণাকে সযত্নে লালন করেছে নিজের মনে, সেই বিশ্বাসের জোরে লিখে ফেলেছে চার-পাঁচখানা বই

হবার মত গল্প আর খান-দশেক উপন্যাস। এমন অমানুষিক হিউমারহীনতা যদি পৃথিবীতে সম্ভব, তা হ'লে আমরা হাসবো কোন মুখে? রবিবার সকালে ও যখন আসবে, ওর সঙ্গে যে-সব কথাবার্ত্তা বলতে হবে, তা মনে করে' তখনই আমার মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—এই ছেলেমানুষি-খেলা কত আর ভালো লাগে। বয়েস যখন কম ছিলো, এ থেকে এক-রকমের আমোদ পাওয়া যেতো, কিন্তু এখন তা কেবলই ক্লান্তিকর—আর এমন অপরিসীমরূপে অর্থহীন! সব চেয়ে কি ভালো নয় তা'কে মুখের উপর স্পষ্ট করে' বলা—কিন্তু কেন? কী দরকার? পরমুহূর্ত্তেই আমার মনে হ'লো, কী দরকার ওর মোহ ভেঙে দিয়ে? জীবনে এমনিতেও তো দুঃখের অভাব নেই। কেন নয়—যদি ওর একটু ভালো লাগে, যদি ও একটু সুখী হয়? আর যা-ই হোক, এতে তো কারো ক্ষতি হচ্ছে না কোনো।

তখন আমি ঐ-রকম ভেবেছিলুম, কিন্তু পরে—ও-কথা মনে করে' তীব্র আত্ম-অভিশাপে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠেছিলো। তখনও হয়-তো সময় ছিলো, তখনও ভবভূতিকে বাঁচাতে পারতুম। আমিই পারতুম। কিন্তু আমি নিজকে ছেড়ে দিলুম সেই ভালো-মানুষির হাতে—কালান্তক দুর্ব্বলতা!

রবিবার সকালে ভবভূতি যখন এলো, আমি তখনও বিছানায় শুয়ে। ঘড়িতে তখন যে-সময়, সেটা ভদ্রব্যক্তির শয্যাত্যাগের

লগ্ন অনেক্ষণ অতিক্রম করে' গেছে। আর ভবভূতি এতদূর থেকে এসে উপস্থিত হ'তে পারলো, আমার কিনা ঘুমই ভাঙে নি। দস্তুরমত লজ্জিত বোধ করলুম। প্রয়োজনাতিরিক্ত হৃদ্যতার সুরে বললুম, 'আরে এসো, এসো।'

'তোমার ঘুম নষ্ট করে' দিলুম নাকি?'

'পাগল—ঘুম কখন ভেঙে গেছে, খামকা শুয়ে ছিলুম। —বোসো।'

ভবভূতি বসে' একবার চারদিকে তাকিয়ে বললে, 'বাঃ বেশ ঘরটি তোমার।'

'বাইরে থেকে দেখতে অমন ভালোই', ভবভূতির সামনে নিজকে খর্ব্ব করা আমার কর্ত্তব্য মনে হ'লো, 'কিন্তু কত যে অসুবিধে এ-বাড়ির—' কথাটা একটা ইঙ্গিতময় অসমাপ্তিতে ফেলে রেখে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি চা খাও তো?'

'অভ্যেস নেই—'

'খাও না এক পেয়ালা।'

'না—না, থাক্—আচ্ছা দাও।'

যে-কোনো তুচ্ছ জিনিস গ্রহণে ভবভূতির এ-কুণ্ঠা একটা লক্ষ্য করবার জিনিস। সমস্ত জীবন বঞ্চিত, কিছুই ও সহজে নিতে পারতো না। ও জানতোই না চাইতে। পৃথিবীর সাধারণ জীবন সম্বন্ধে ওর কোনো মোহ ছিলো না। সাহিত্যিক খ্যাতির অমরত্বের

উপর চোখ, উপস্থিত ও পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে এতটুকু পাবার যোগ্যতাও যে ওর আছে, এমন ধারণা ওর মনে স্থান পায় নি।

চা এলো। দুটো পেয়ালায় চা ঢেলে আমি অলসভাবে মুড়মুড়ে খবরের কাগজের ভাঁজ খুললুম। ভবভূতি আমার তখনো ঘুমের নেশায় আরক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কাল অনেক রাত জেগেছো বুঝি?'

'শুতে-শুতে আমার একটু দেরিই হয়।'

'নতুন কিছু লিখছো?'

সত্যি বলতে, আগের রাত্রে যে-উপলক্ষ্যে রাত জেগেছি সেটা সাহিত্যসৃষ্টি নয়। তবু মান বজায় রাখবার জন্যে বললুম, 'হ্যাঁ, একটা গল্প...'

ভবভূতি একটু আড়ষ্টভাবে, কথাটা বলা উচিত হবে কি না হবে যেন মনে-মনে এই বিচার করতে-করতে জিজ্ঞেস করে' ফেললো, 'কত পাও একটা গল্পের জন্য?'

'পাই!' নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে আমার অভিযোগ অসাধারণরকম তীব্র হ'য়ে উঠলো, 'মুখে আনা যায় না। আমাদেরকে যা করতে হয় তা নিছক ক্রাইম।' বলতে-বলতে আমি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলুম, 'খাচ্ছো না যে?'

ভবভূতি যেন আমার মুখের এই কথার জন্যই অপেক্ষা

করছিলো : যেন বাধ্যভাবে, নেহাৎই আমার কথা রাখবার জন্যে সে পিরিচ থেকে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে নীরবে চুমুক দিতে লাগলো। নীরবে বললুম এই অর্থে যে সে কথা বলছিলো না; কিন্তু তা'র ওষ্ঠাধর যখন পেয়ালার প্রান্তে সংযুক্ত হ'য়ে মুখের ভিতর চা টেনে নিচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে যে-শব্দ উৎপন্ন হচ্ছিলো কোনো সাধারণ মানুষ কথা বলতে অত আওয়াজ করে না। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ভবভূতি তা'র চা উপভোগ করছে। সশব্দে, গোলমেলে-ভাবে বলা যায়, নিয়মিত, দীর্ঘ চুমুকের পর চুমুক,—ভবভূতি চা খেতে লাগলো। তাঁ'র মুখে-চোখে একটা তন্ময়তা; চুমুক দেবার আগে সে পেয়ালার মধ্যে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিচ্ছে; যেন প্রতিবার দেখে নিচ্ছে আর কতটা বাকি।

একটু পরে আমি বললুম, 'বাঃ, ডিম-টিম কিছু খাবে না?'

'ডিম?' ভবভূতি যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো।

'খাও একটা', নিজের অজান্তেই আমার বলার ধরণে আদেশের সুর ফুটে উঠলো। 'খাও না', দ্বিতীয়বার, মোলায়েম করে' আমি বললুম।

হাতের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে সে খেলো ডিম। যেন কোনো কর্ত্তব্য পালন করলে। খেতে-খেতে একটি কথা বললে না। তারপর পেয়ালার বাকি চা তেমনি দীর্ঘ, সশব্দ চুমুকে-চুমুকে শেষ করতে লাগলো। আমি খবরের কাগজের

ছবি দেখছিলুম ; শব্দ থামতেই বুঝলুম তা'র চা শেষ হয়েছে। চোখ তুলে বললুম, 'আর-একটু চা ?'

'না, আর নয়।'

'নাও একটু', বলে' সে দ্বিতীয়বার প্রতিবাদ করতে পারার আগেই তা'র পেয়ালা অর্দ্ধেক ভরে' দিলুম। 'এই—এই হবে', মুহূর্ত্তের জন্য তা'র মুখের চিরন্তন ধূসরতায় একটু আলো খেলে' গেলো,—'যা-ই বলো, গরম চা খানিকটা খেলে লাগে বেশ।'

অবাক হলুম, তা'কে তা'র নিজের লেখার বাইরে কোনো বিষয়ে এমন স্পষ্ট মত প্রকাশ করতে শুনে। অনভ্যস্ত মাথায় ট্যানিন-রস হঠাৎ একটু নেশার মত সৃষ্টি করে. তা'রই ফল। অনভ্যস্তের উপর ট্যানিনের প্রভাবও আশ্চর্য্য। ছেলেবেলায়, বাইরে কোথাও ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি করে' লাল এবং গরম হ'য়ে কোনো বিকেলে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে পড়ে' দেখেছি. সবাই চা খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মা-র পেয়ালা থেকে ঢক্‌ঢক্ করে' কয়েক চুমুক দিয়ে আবার দৌড়—পরিত্যক্ত, তখনো-অসমাপ্ত খেলার উদ্দেশ্যে। কী ভালোই লাগতো সেই কয়েক চুমুক। এখনো মনে পড়ে। এখন বুঝতে পারছি, ট্যানিন-সঞ্চারে অতি ক্ষণিক—এবং অতি মধুর—একটু নেশা হ'তো। হায়রে, এখন বসে'-বসে' কুঁদে-কুঁদে ছ' পেয়ালা চা গিললেও স্নায়ুগুলো সাড়া দেয় না, ক্লান্তি না-কেটে বরং আরো যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। এখন ঠিক সেটুকু

নেশা—তেমনি মৃদু, তেমনি ক্ষণিক—করতে হ'লে—কত তা'র জন্য আয়োজন, কত অর্থব্যয়।

আমাকে আর-একবার পেয়ালা ভরতে দেখে ভবভূতি মন্তব্য করলে, 'তুমি যে ভীষণ চা খাও দেখছি।'

'বিষপানে আত্মহত্যা', বলে' আমি হেসে উঠলুম।

ভবভূতি সে-হাসিতে যোগ দিলে না; গম্ভীরমুখে বললে, 'কেন, চা খেতে তো বেশ ভালোই।'

'হ্যাঁ, বেশ ভালোই', আমি তৎক্ষণাৎ সায় দিলুম। ভবভূতির উপস্থিতিতে কোনো হাস্যরসাত্মক কথা বলবার লোভ আমি এর পর থেকে সাবধানে সম্বরণ করেছি।

সিগ্রেট ধরিয়ে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালুম। ভবভূতি ক্ষীণ একটু হেসে বললে, 'তুমিই সুখে আছো, রামতনু।'

খবরের কাগজের উপর চোখ নামিয়ে আমি চুপ করে' রইলুম। কী বলতে পারতাম? হ্যাঁ, সন্দেহ কী—ভবভূতির তুলনায়, সন্দেহ কী, আমি সুখে আছি। আমি যা বাড়ি-ভাড়া দিই, ওর তা এক মাসের উপার্জ্জন। সিগ্রেটে আমার যত পয়সা যায়, সমস্ত পরিবার সুদ্ধ ওর এক মাসের খাওয়া-খরচ অত হয় না। আমি স্বাধীন (মানে, এই বর্ত্তমান যান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির পক্ষে যতটা স্বাধীন হওয়া সম্ভব)—অন্তত, আমি ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিন সকাল থেকে দুপুর অবধি বাড়ি বসে' গল্প করে' কাটিয়ে দিতে পারি,

যে-কাজটা আজ করা উচিত সেটা আমার কাল করলেও চলে। আমার কোনো উপরিওয়ালা নেই—বরং, যে-সম্মিলিত পাঠকপিণ্ড আমার উপরিওয়ালা তা'কে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই নে বলে' তা'র অস্তিত্ব ভুলে থাকতে পারি। তা ছাড়া, সবার উপর, আমার আছে সাহিত্যিক খ্যাতি, যা'র জন্য সেই কবে থেকে কী ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী চেষ্টায় ভবভূতি মরে' যাচ্ছে। পৃথিবীতে যদি নিছক অধ্যবসায়, সততা, উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা, কঠিন, নিষ্করুণ নিষ্ঠার কোনো মূল্য থাকতো তা হ'লে ভবভূতির স্থান হ'তো চিরকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে। যদি এই বিশ্বের পরিচালনায় কোথাও বিন্দুমাত্র ন্যায়জ্ঞান থাকতো, তা হ'লে এতদিন ধরে' এত কষ্ট করে', সংসারের এমন দারুণ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে, অবিশ্বাস্য এই ধৈর্য্য সহকারে, অকল্পনীয় অন্ধতায়—সে যে এতদিন ধরে' এত রাশি-রাশি লিখতে পেরেছে, শুধু সেই জন্যেই তা'র নাম থাকতো অমর হ'য়ে। কিন্তু তা হবার নয়। ও-সব ভালো-ভালো নৈতিক গুণের কোনো মূল্য দিতে পৃথিবী প্রস্তুত নয়। ব্যাপারটা শোকা-বহ হ'তে পারে, কিন্তু সত্যি।

ভবভূতির মুখোমুখি বসে', সিগ্রেটের সুরভিত ধূম বুকের মধ্যে গ্রহণ করতে-করতে, উচ্চ সমাজের এক বিবাহের বর্ণনা পড়তে-পড়তে (কেন? কেন আমাকে জানতেই হবে অমুক বাঙালি জস্‌টিসের দৌহিত্রীকে বিয়ের সময়কার ক্রীম রঙের শাড়িতে কেমন

'চার্মিং' দেখাচ্ছিলো—অমুক জস্‌টিসের দৌহিত্রী বিয়ে করুক কি গলায় দড়ি দিয়ে মরুক কি স্বাস্থ্য ভালো করবার জন্য জর্মানির কোনো স্পা-তে যাক—আমার তা'তে কী ?), সকালবেলাকার উষ্ণ আলস্য পোহাতে-পোহাতে—আমার বন্ধুর তুলনায় নিজকে আমার কেমন-যেন ছোট মনে হচ্ছিলো, একটু খেলো। আ, আমার এই চায়ের পেয়ালা আর ছবিদার কাগজ, রোদে-উজ্জ্বল এই ঘর ভবে' আলস্য-সৌগন্ধ্য—কী স্থূল, সাধারণ, অসহ্যরকম মধ্যবিত্ত, দস্তুরমত পেতি-বুর্জোয়া। এই কি একজন আর্টিস্‌টের জীবন ? আমি ম্যাক্সিম গর্কীর কথা ভাবলুম, বেইঠোফেনের··· আমার বন্ধু ভবভূতির কথা ভাবলুম। যা-ই বলো না কেন, কৃতিত্ব জিনিসটাই ভাল্গার, কোনো আত্ম-তৃপ্ত মানুষের মত গ্যক্কার-জনক দৃশ্য পৃথিবীতে কমই আছে। ব্যর্থতায় গৌরব আছে, ব্যর্থতা মহান্। ব্যর্থতা রোমান্টিক, দৃশ্য-হিসেবে ব্যর্থতা খুব জমকালো। কৃতীকে আমরা সম্মান করি, জয়মাল্য পরিয়ে দিই তা'র গলায়—কিন্তু মনে-মনে আমরা ভালোবাসি তা'কেই, জীবন পণ করে' যে চেষ্টা করলো—চেষ্টা করে' পারলো না। আমাদের হৃদয়ের স্নেহে পরাজিতরই স্থান। নেহাৎই কৃতী হওয়া—তা'র মূলগত সাধারণত্ব থেকে আমাদের মুখ ফেরাতে ইচ্ছে করে। বিজয়ী বীরকে বাহবা দিতে-দিতেও আমাদের মন তা'র ভাল্গারিটিতে অস্বস্থ বোধ না করে' পারে না।

তবু যদি আমাদের জীবন নিখুঁত নৈতিক বিধান মেনেই চলতো, যদি প্রত্যেক মানুষ তা'র একনিষ্ঠ চেষ্টার পরিমাপেই সব সময় ফল লাভ করতো—যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থা এমন অসম্ভব এলোমেলো, চিন্তাহীন না হ'তো, তা হ'লে—তা হ'লে আমার এই আরাম, এই খ্যাতি, এই—যা-কিছু আজ ভবভূতি মুগ্ধচোখে (কী ক্ষীণ, কী ভীরু, যে-ঈর্ষাটুকু তা'র দৃষ্টিকে মাঝে-মাঝে ঘোলা করে' তুলছে—জোর করে' ঈর্ষা করবার শক্তিও তা'র নেই) তাকিয়ে দেখছে, তা সবই যেতো তা'র কাছে। তা-ই উচিত ছিলো। আমি এ-সবের জন্য কিছুই করি নি; এর যোগ্যতা আমার নেই। সহজেই আমার কাছে এ-সব এসে গেছে, বড় বেশি সহজে। আমি কখনো কোনো কঠিন সাহিত্যব্রত গ্রহণ করি নি, তিক্ত নিষ্ঠুর কোনো সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয় নি; আমি কখনো অনাহারের তাড়নায় আত্মহত্যার কথা ভাবি নি, কখনো অন্ধকার রাত্রে একা ছটফট করতে-করতে —যদি বিশ্বে কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে তা'র কাছে নিজের ব্যর্থতা আর বিক্ষোভকে অঞ্জলির মত তুলে ধরি নি। তবু আমারই হ'লো। লোকে আমাকে কতদিন মনে রাখবে, কাল-স্রোতের কোন্ বিশেষ তরঙ্গের আঘাতে আমি ভেসে যাবো—সময়ের অসীমতা দিয়ে বিচার করতে গেলে সেটা আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। সবই যাবে, আমিও না-হয় গেলাম; কিন্তু এটা

তো রয়ে' গেলো—উজ্জ্বল কয়েকটা মুহূর্ত্ত, সকালবেলাকার এই সুরভিত আলস্য। এ-সত্য থেকে তো নিষ্কৃতি নেই যে আমি এটা পেয়ে গেলুম, আর—আর ভবভূতি তা'র আপিসের ডেস্কে···। অথচ এ নিয়ে বিশেষ-কোনো ভাবনা ছিলো না আমার মনে, এর জন্যে কোনো অসাধারণ দুঃখ আমাকে পেতে হয় নি। বরং, আমার সমস্ত জীবন—ঠিক গোলাপের বিছানা না হ'লেও—অপেক্ষাকৃত সুখেই কেটেছে, খ্যাতি যেন আমার কাছে এসেছিলো গায়ে পড়ে', অনেক বন্ধুর ভালোবাসায় আমি ঐশ্বর্য্যবান। এদিকে ভবভূতি—কী তা'র জীবন, আর সেই সঙ্গে কী তা'র প্রতিজ্ঞা। ঘোরতর তামসিক এই নিরবচ্ছিন্ন চরম দারিদ্র্য, আর তা'র মধ্যে তা'র অবিচল উন্মত্ত সঙ্কল্প। যদি ব্রতগ্রহণ দিয়েই কথা, যদি দুঃখের দুরূহ মূল্যদান দিয়েই বিচার, তা হ'লে ভবভূতির সঙ্গে কা'র তুলনা? সুখী হ'তে, মন খুলে হাসতে ও যেন কখনো জানেই নি। ওর জন্ম, ওর শিক্ষা, ওর শৈশবের পারিপার্শ্বিক—তারপর আজ ওর এই কেরানিত্ব, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে-না-দেখা বিবাহিত জীবন—প্রতি মুহূর্ত্তে ও অতি ভয়াবহ মূল্য দিয়ে আসছে। ঐ-রকম জীবন যা'র, সে যে নিছক বেঁচে থাকবার বেশি কিছু করতে পারে, তা আমি কখনো কল্পনা করতে পারতুম না। আর ভবভূতি ক্লান্ত লিখে গেছে—অর্দ্ধাহারে, রুগ্নদেহে নিজের প্রাণ বাজি [illegible] লিখে গেছে, তবু সে হারলো। তবু সময়ের

স্রোতে একটা আঁচড়ও সে কাটতে পারলে না। কেন এমন হয়? আমরা জানি নে। আমরা কিছুই জানি নে; শুধু জানি যে এমনিই হয়।

বুঝতে পারছিলুম ভবভূতি আমার কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করছে। তা'র হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলুম। এখন কাজের কথা, তা হ'লে। হাতের সিগ্রেটটা ছাইদানের মধ্যে দুমড়ে রেখে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার লেখা-টেকা কিছু এনেছো নাকি সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, এই একটা—'

'কই, দেখি', আমি ওকে সাহায্য করলুম।

ও প্যাকেটটা আমার হাতে দিলে। খুলে দেখলুম, বড়-বড় ছেলেমানুষি হস্তাক্ষরে ফুলস্ক্যাপের তিন শো বারো পৃষ্ঠার এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

ভবভূতি বললে, 'পড়ে' দেখো।'

'নিশ্চয়ই', এ-ছাড়া আমার মনে কোনো উত্তর এলো না; যদিও জানতাম যে শতবর্ষ পরমায়ু পেলেও ঐ পাণ্ডুলিপি আমি কখনো পড়বো না।

'এ-বইটা', ভবভূতি বললে, 'আমার নিজের খুব ভালো লাগে না; কিন্তু সেইজন্যই এটা নিয়ে এসেছি। প্রকাশকদের হয়-তো বা পছন্দ হ'তে পারে। তা'র উপর, তুমি যদি একটু বলো—'

'আমার যেটুকু সাধ্য, আমি করবো।' জেনে-শুনে আর-একটা মিথ্যে কথা বলতে হ'লো। অবিশ্যি, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলেও যদি ভবভূতির বই প্রকাশিত হবার লেশমাত্র সম্ভবনা থাকতো, তা হ'লে, কোনো সন্দেহ নেই, আমি তা করতাম। কিন্তু ওর পাণ্ডুলিপির উপর একটু চোখ বুলিয়েই যা বুঝতে পেরেছিলাম, তা'তে সে-পরিশ্রম বাঁচানোই আমার কাছে সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিলো।

'এ-বইটা যদি বেরোয়', ভবভূতি বললে, 'আর লোকে যদি নেয়, তা হ'লে আস্তে-আস্তে সত্যিকারের ভালো বইগুলোও বা'র করা যেতে পারে। লোকের এ-ধরণের জিনিস পড়ে' তো অভ্যেস নেই ; সইয়ে-সইয়ে স্বাদ দেয়াই ভালো।'

'ঠিক কথা', আমি বললাম। ভবভূতির মুখ থেকে ও সব কথা শোনা প্রায় কষ্টকর। না, হাসাও যায় না ; হাসতেও কষ্ট হয়। ও ছিলো একজন লোক, যা'র কোনো হিউমারের বালাই ছিলো না। আর, সে-কথাই যদি ওঠে, অনেক-কিছুরই বালাই ওর ছিলো না ; বিধাতা ওকে তৈরি করেছিলেন ডিমের খোসার মত শূন্য করে'। সব মানুষই কিছু-একটা প্রতিভাবান হয় না ; কিন্তু কোনো মানুষের চরিত্র যে এমন একটানা-বিবর্ণ, এমন ভীতিকররকম লেপাপোঁচা, একেবারেই কোনো কোণখোঁচছাড়া হ'তে পারে, তা বিশ্বাস করা শক্ত। সংসারে, ঈশ্বর জানেন,

সংসারে মূঢ়তার অভাব নেই : বরং, মূঢ়তার ভয়ঙ্কর সর্ব্বব্যাপিতার দৃশ্যে এক-এক সময় বনবাসী হ'তে ইচ্ছে করে। ঈশ্বর জানেন, সংসারে মাছির মত, ইঁদুরের মত, সাপের মত মানুষ চারদিকে কিল্‌বিল্‌ করছে—এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে হাসি, যদি অবিশ্যি তাদের আক্রমণ কাটিয়ে উঠে জীবনীশক্তি বজায় রাখতে পারবার মত ভাগ্যবান আমরা হই। কিন্তু ভবভূতির নির্ব্বুদ্ধিতা এমনই যা'র সম্মুখীন হ'লে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়, হাসি আসে না। ও যেন ঈশ্বরের নিজের হাতের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র ; সে-অতিরঞ্জন এতই মাত্রাহীন যে হাস্যরসের সীমানা উল্লঙ্ঘন করে' তা প্রায় ভয়াবহতার স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। ওর যদি মাঝামাঝিগোছের কি তা'র চেয়ে একটু নিম্নস্তরেরও বুদ্ধি থাকতো, তা হ'লে ও বুঝতে পারতো ও কী করছে। লেখক হবার কোনোরকম সঙ্গতিই ওর ছিলো না—কিন্তু তা তো অনেক লোকেরই থাকে না। তেমনি, লিখতে তা'রা যায়ও না। যেটা সত্যি শোকাবহ সেটা এই যে কাগজের উপর কতগুলো পর-পর সাজানো অক্ষর কত প্রাণহীন, কত অনিপুণ, কত শূন্যময় হ'লে তা'কে আর লেখা বলে না, সে জ্ঞানও ওর ছিলো না। আর সেটাই ওর কাল হ'লো। সত্যি-সত্যি ওর লেখা বাঙ্‌লা মাসিকপত্রেও ছাপাবার অযোগ্য। আমি এখনো মাঝে-মাঝে ভাবি, যে-লেখা চোখ মেলে' আধ মিনিট পড়া যায় না তা ও কী করে' "দিনের

পর দিন অক্লান্ত, বীভৎস অধ্যবসায়ে লিখে যেতে পারতো। আর-সব বাদ দিয়ে, শুধু ঐ লিখে যেতে পারার জন্যেই ওর প্রতি প্রশংসায় স্তব্ধ হ'য়ে যেতে হয়। বিধাতা সাধারণত একদিকের অভাব অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে দেন : ভবভূতিরও ক্ষতিপূরণ হয়েছিলো—অতি-মানবীয় ধৈর্য্যে, উদ্দেশ্যের আত্মগ্রাসী অবিচলিতত্বে—যা প্রায় উন্মত্ততার মত। অনুরূপ অবস্থায় যে-কোনো স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ বাল্যকাল অতিক্রম করবার সঙ্গে-সঙ্গেই সাহিত্যিকত্ব ছেড়ে দিয়ে আরো বেশি অর্থোপার্জ্জনে মন দিতো—এবং সেদিকে হয়-তো সফলও হ'তো। এতখানি সময় ও পশুশক্তি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত করলে ভবভূতিও কী করতে না পারতো, জোর করে' বলা যায় না। কিন্তু সেদিক দিয়ে ওর যেন কোনো আকাঙ্ক্ষাই ছিলো। ওর অবস্থা সম্বন্ধে ও যে অখুসি ওর কোনো কথায় কি আচরণে এমন আমার কখনো মনে হয় নি। এ-সব তুচ্ছ, পার্থিব জিনিস সে অনায়াসে অবহেলা করতে পারে। সে কী খায় আর কী-রকম বাড়িতে থাকে, তা'তে কী এসে যায়—অনেক ঊর্দ্ধে তা'র আসন, সে বিরাট স্রষ্টা, অমরত্বে তা'র দাবি। এখন না-হয় কেউ তা'কে না-ই জানলো, তা'র সময় আসবে। আসবেই। সেইজন্য, বিবেচনাশীল, সে প্রথমটায় তা'র অপেক্ষাকৃত বাজে লেখা বাঙালি পাঠকসাধারণকে দিতে চাচ্ছে—পরে, মুর্খ পাঠকদের যখন একটু গা-সহা হ'য়ে এসেছে, আস্তে-

আস্তে তা'র সত্যিকারের ভালো জিনিসগুলো বা'র করবে। ততদিন, ভদ্র-ছদ্মবেশী বস্তি-অবস্থার মধ্যে বসবাস করতে তা'র আপত্তি নেই।

'ঠিক কথা', আমি আবার বললুম।

'বোধ হয় কেউ নিতেও পারে—কী বলো?'

'নেবে না!' আমি সজ্ঞানে পাপের উপর পাপ চাপাতে লাগলুম, 'কিন্তু প্রথমটায় জানোই তো—'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তুমি চেষ্টা করবে? চেষ্টা করবে?' ভবভূতির কণ্ঠস্বরে এমন মিনতির করুণতা ফুটে উঠলো যে ও যদি সত্যি চলনসইও কিছু লিখে থাকতো, তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে ওর প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতুম।

'আমার যেটুকু সাধ্য', গম্ভীরভাবে আমি বললুম।

মুহূর্ত্তের জন্য ওর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। আমি যখন বলেছি—তখন ওর বই বেরিয়ে গেছে বললেও দোষের হয় না। কী গভীর, সম্পূর্ণ আশ্বাস ওর আমার কথায়। আমার মনটা একবার মোচড় দিয়ে উঠলো। একবার মনে হ'লো বলি, কিন্তু ওর মুখের সেই ক্ষণিক দীপ্তি দেখে বড় মায়া হ'লো। হায়রে মানুষের দুর্ব্বলতা!

'তোমার নতুন কোনো বই বেরোচ্ছে না পূজোয়?' ভবভূতি জিজ্ঞেস করলে।

'হ্যাঁ, খান ত্রিশেক।' সংখ্যাটাকে আমি সাবধানিভাবে কমিয়ে বললুম।

'ইস্, অনেকগুলো তো বই হ'য়ে গেলো তোমার।'

'হ্যাঁ', আমি উচ্চস্বরে হেসে উঠলুম, 'বইয়ের সংখ্যা অশ্লীল-রকম বেড়ে যাচ্ছে।'

'তুমিই তো আজকালকার দিনের—'

'যা বলেছো!' আমি তা'কে কথাটা শেষ করতে দিলুম না, 'হাঁড়ি চড়াতে হবে, তাই আমার লেখা। ওকে কি আর লেখা বলে!'

'হ্যাঃ, তোমার আবার হাঁড়ি-চড়াবার ভাবনা!' আমার কথাটায় যথেষ্ট সত্য ছিলো, কিন্তু ও সেটাকে সম্পূর্ণ বিনয় হিসেবে নিলে।

'সে-ভাবনা যা'তে না থাকে, সেইজন্যেই তো—'

'টাকার জন্য লিখলে লেখা—একটু খারাপ হ'য়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, না?'

'শুধু তাই!' অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগলুম, 'যা'রা পয়সা দেয় তাদের কাছ থেকে কত অসহ্য অপমান। তোমার তো সেটাই একটা মস্ত সুবিধে', আমার উৎসাহ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো, 'তুমি কারো কাছে প্রার্থী নও। তোমাকে হিংসে হয়, ভবভূতি, তোমার মত দুঃখ নেবার সাহস যদি আমার থাকতো!'

ভবভূতি মিটমিটে চোখে তাকালো। তা'কে কোনো দুঃখ সম্বন্ধে খুব বেশি সচেতন মনে হ'লো না। আমি যে তা'কে ঈর্ষা করি, এই রোমাঞ্চকর সংবাদেও তা'র মুখে কোনো ব্যঞ্জনা ফুটলো না। আলোহীন, ভারিভাবে সে বললে, 'হয়-তো এরই মধ্যে তুমি ভালো লিখবে।'

নাঃ, আর নয়। নিজের এই বিশ্রী কপটতায় নিজেরই ঘেন্না ধরে' গেলো। একটা অপরাধের অস্বস্তিকর চেতনায় ভারি হ'য়ে উঠলো সমস্ত মন। এ আমি কী করছি? এ-রকম ভাবে আর-কিছুদিন চললে ভবভূতি যে দস্তুরমত বেসামাল হ'য়ে উঠবে। একদিন ওকে যে-নিষ্ঠুর আঘাত দিতে হবে—অনিচ্ছায়, কিন্তু অনিবার্য্যরূপে—তা'র কথা ভেবে অত্যন্ত মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। কিন্তু ঈশ্বর আমার পক্ষে সেটা সহজ করে' দিয়েছিলেন।

কী বলবো ভাবছি এমন সময় আর-একজন এলো। সাহিত্যিক-বন্ধু। ভবভূতির দিক থেকে মন সরিয়ে নেবার একটা উপলক্ষ্য পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। কিন্তু একটু পরে ও-ও উঠলো।

'কী, যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, চলি এবার।'

আমি কোনোরকম মন্তব্য করলুম না; সাহিত্যিক-বন্ধুর সঙ্গে আমার অনেক পেশাদারি আলাপ করবার ছিলো। উঠে গিয়ে

ওকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলুম। দরজার বাইরে এসে ভবভূতি বললে, 'তা হ'লে আমি—কয়েকদিন পর এসে খোঁজ নিয়ে যাবো।'

'তা তো যাবেই, কিন্তু তা ছাড়াও তুমি আসতে পারো—যদি তোমার ইচ্ছে হয়।' ভবভূতি যাবার জন্য উঠতেই আমার তা'কে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছিলো ; এখন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তা'র প্রতি উষ্ণ সহৃদয়তায় আমি যেন উন্মুখ হ'য়ে উঠলুম।

ফিরে এসে বসেছি, বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলে, 'কে হে এই লোকটা ?'

'আছে', আমি সংক্ষেপে বললুম, 'আমার এক বন্ধু।'

বন্ধুটি চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। 'তোমার বন্ধু ! তোমার এত-সব বন্ধু আছে জানতুম না তো।'

ভবভূতির অস্তিত্বের জন্য দায়ী ও ক্ষমাপ্রার্থী, আমি বললুম, 'ছেলেবয়েসের...'

টেবিলের উপর ভবভূতির পাণ্ডুলিপিটার উপর বন্ধুর চোখ পড়লো। বাঁকা হেসে বললে, 'কী, তোমার বন্ধু লেখা-টেকা কিছু দিয়ে গেলো নাকি ? ঐ কাগজের তাড়া—'

পাণ্ডুলিপিটা তাড়াতাড়ি বন্ধুর নাগালের বাইরে সরিয়ে বললুম, 'ও কিছু নয়', বলে' অন্য কথা পাড়লুম।

দু' সপ্তাহ পর ভবভূতি আবার আসতে আমি বললাম,

দের দেশের সব প্রকাশক—তা'দের কি বুদ্ধিশুদ্ধি জ্ঞানগম্যি ছু আছে? হাতের কাছে যে-কোনো রাবিশ পায়, তা-ই ছাপে, লেখক একটু নাম-করা হ'লেই হ'লো। নাম-করা!—' তীব্র উষ্মার স্বরে আমি জুড়ে দিলুম, 'কী-সব লিখেই নাম করেন এক-একজন!'

ভবভূতির ক্লান্ত চোখ নিরাশায় আনত হ'য়ে এলো: 'হলো না তা হ'লে?'

'পাগল!' আমি রীতিমত উত্তেজিত হ'য়ে পড়লুম, 'এটা তো জানো যে প্রচলিত ফ্যাশানের বিরুদ্ধে যে যায়, ত'ার পক্ষে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা কত কঠিন! সাহিত্যেও—আর্টেও সাময়িকভাবে এই ফ্যাশানের বিধানই চূড়ান্ত; হাতে-হাতে যশ আর টাকা পাবার লোভ যাদের, তা'রা এই ফ্যাশানেরই দাসবৃত্তি করে। কিন্তু তুমি তা করো নি, করতে পারো না। যদি পারতে, তা হ'লে তুমি আর তুমি থাকতে না। এ তো জানা কথা—তোমার যে একটু সময় নেবে। আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দাও; স্ট্রেচির এমিনেণ্ট্ ভিক্টরিয়ান্স্ বা'র করতে প্রথমটায় লণ্ডনের কোনো প্রকাশকই রাজি হন্ নি।'

স্ট্রেচির নাম শুনে' ভবভূতির মুখে কোনো দীপনা প্রকাশ পেলো না; এমন প্রমাণ পেলুম না, আমার কথা শুনে ওর মনটা আত্ম-গৌরবে উষ্ণ হ'য়ে উঠেছে। একটু চুপ করে' থেকে ও

নির্জীবস্বরে বললে, 'একবারেই তো আর কারো নাম হয় না। আজ যা'র নাম কেউ জানে না, হয়-তো একখানা বই বেরোলেই—'

'নিশ্চয়ই!' সোৎসাহে আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই! কিন্তু এ-ও বলছি, ভবভূতি, তোমার পক্ষে এই আগ্রহ অশোভন হ'য়ে পড়ছে। এটা কেন বুঝতে পারছো না যে আগুন আর প্রতিভা কেউ চাপা রাখতে পারে না; একদিন তা ফুটে বেরোবেই। বেরোবেই। আমার মত লেখককে যে-সব জিনিসের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়, তোমার কাছে সে-সব নিজে থেকে, গায়ে পড়ে' আসবে; তোমার পক্ষে চুপচাপ বসে' থাকবার বেশি কিছুই করবার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমি যা লিখি', 'ভবভূতি একটা খাঁটি কথা বললে, 'লোকের তা পড়া তো দরকার।'

'যথাসময়ে', সংক্ষেপে, হেঁয়ালি-ধরণে আমি বললুম।'

'হ্যাঁ, যথাসময়ে', গম্ভীর নিম্নস্বরে ভবভূতি বললে, 'সে-সময়ের দেরি থাকতে পারে, কিন্তু', এখানে আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম, 'যখন আসবে, যখন আসবে—'

ভবভূতি তা'র কথা শেষ করবার ভাষা পেলো না; আমি তাড়াতাড়ি বলে' উঠলাম, 'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু যতদিন তা না আসে', সকুণ্ঠে, সলজ্জভাবে ভবভূতি বললে, 'একটু-একটু চেষ্টা করতেই বা দোষ কী? যা-ই বলো,

আজকালকার পৃথিবীতে কি আর প্রতিভার সে-রকম আদর আছে !'

'আজকালকার পৃথিবীর কথা আর বোলো না। একটা সিগ্রেট খাও।'

'আমি ভাবছি' তোমাকে আর একটা MS দিয়ে যাবো। বলা যায় না—হঠাৎ কারো হয়-তো খেয়াল হ'তে পারে—'

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে ভবভূতি আর-একটা দিয়ে গেলো। তৃতীয়টা ফেরৎ দেবার সময় আমি প্রকাশকদের ভয়ঙ্কর নির্ব্বুদ্ধিতা ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য বিজয়-গতি সম্বন্ধে আরো জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিলুম। ঠিক সেই সময়ে, দুর্ভাগ্য-বশত, ডাকযোগে এক মাসিকপত্র এসে উপস্থিত হলো : তা'তে, দেখা গেলো, 'আধুনিক সাহিত্যে রামতনু' নামে এক প্রবন্ধ ; একফর্ম্মা-ভরা, কোটেশন-বহুল আমার এক উচ্ছ্বসিত স্তুতি। ভবভূতি লেখাটা খানিকক্ষণ উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখে চুপ করে' রইলো।

আমি হেসে বললুম, 'কী লিখেছে ইডিয়টচন্দ্র ?'

প্রত্যুত্তরে ম্লান হেসে ভবভূতি বললে, 'তুমি একেবারে দিগ্বিজয় করে' ফেলেছো, দেখছি।'

সশব্দে, আমি হেসে উঠলুম।—'আমি হচ্ছি ফ্যাশানের ঢেউয়ের উপরকার ফেনা, আজকের এই ক্ষণিক সূর্য্যালোকে ঝিক্‌মিক্

করছি। হ'তে পারে, এই ঢেউ আরো স্ফীত হ'বে; আমার ঝিকিমিকি আরো চোখ-ধাঁধানো হ'বে; কিন্তু তারপর—এই ঢেউ যখন ভেঙে পড়বে—কারণ, ভেঙে পড়তে তা বাধ্য—কোথায় থাকবো আমি? সময়ের সমুদ্রে একটা বুদ্বুদ, মুহূর্ত্তের একটা রঙিন রামধনু। আর তুমি? তুমি চিরস্থায়ী শিলার মত; তোমাকে ঘিরে সময়ের অনেক জল চিরকাল বয়ে' যাবে; অসংখ্য ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার মধ্যে স্থির, অক্ষয়, তুমি দাঁড়িয়ে।'

আমার এই কথা থেকে ভবভূতির মন গভীর প্রেরণা গ্রহণ করেছিলো কিনা জানি নে, কিন্তু তা'র পরে কিছুকাল আর ওর দেখা পাই নি। ভয় করেছিলাম, ও হয়-তো আরো কোনো পাণ্ডুলিপি আমার কাছে দিয়ে যাবে; ধারণা হ'লো, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে নিজেই নিজের পথ করে' নেয়, সে-বিষয়ে ওর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে আমি সক্ষম হয়েছি। সময় বয়ে' গেলো—আর আমি ভবভূতির অস্তিত্ব প্রায় বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছিলুম। কেননা জীবন জটিল ও বহুমুখী এবং ও এমন লোক নয় যা'র অনুপস্থিতি অনুভব করবার মত। শেষটায়—হিসেব করলে দেখা যাবে, প্রায় চার মাস পরে, কিন্তু জীবিকা-সংগ্রহের সর্ব্বগ্রাসী চেষ্টায় যা'কে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তা'র কাছে তা অতটা সময় মনে হয় না—একদিন ওর এক পোস্ট্কার্ড্ পেলুম: ও রোগে শয্যাগত; আমি কি একবার সময় করে' ওকে দেখে আসতে পারবো?

গেলাম ওকে দেখতে—গলির পর সরু গলি পার হ'য়ে; পুরোনো, বনেদি কলকাতার শ্বাসরোধকারী, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে; গায়ে-গা-লাগা, বিবর্ণ, সূর্য্যহীন অন্তঃপুর-সমন্বিত সব বাড়ির সারি পার হ'য়ে। দিনের বেলায়ই প্রায়-অন্ধকার এক বাই-লেনের ভিতর পাওয়া গেলো ভবভূতির বাড়ি। নিচের তলায়, রাস্তার উপর ওর দু'টি ঘর; তা'রই মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ভালো, সেখানে এক তক্তপোষে বিছানা পেতে চাদরমুড়ি দিয়ে ভবভূতি শুয়ে আছে। ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। কোনো-কালেই ও রোগা বই ছিল না; কিন্তু এখন আর ওকে মানুষ বলে'ই চেনা যায় না। মামির মত শীর্ণ, নীরক্ত বর্ণ-হীন ওর মুখ; কুয়োর মত কোটরের নিচে ভারি, সবুজ জলের মত মিট্‌মিট্‌ করছে চোখ; চোখের নিচে, কপালে ছোট-ছোট সব শিরাগুলো স্ফীত হ'য়ে ভয়ঙ্কর স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে; গালের উপর অনেকদিনের দাড়ি কোনো বিষাক্ত আগাছার মত কুৎসিত। একবার তাকিয়েই উপলব্ধি করলাম, আমি এক মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমি যখন ঘরে ঢুকলুম, ভবভূতির স্ত্রী ওর শিয়রে বসে' হাওয়া করছিলো; আমাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে ঘোমটা টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির চোখ আমার চোখে পড়লো; তা'তে কোনো অসাধারণ লাবণ্য বা দীপ্তি নেই; সে-মুখের একমাত্র ভাব-ব্যঞ্জনা হচ্ছে অমানুষিক সহনশীলতা; সে-মুখে

ভাগ্যের হাতে চরম আত্মসমর্পণের নির্ব্বুদ্ধিতা, আলোকহীনতা। অনুমান করলুম, মেয়েটির বয়েস আঠারোর মত হবে, মেয়েলোকের পক্ষে যে-বয়েসটা ঐশ্বর্য্যের মত—কিন্তু এই তা'র রূপ! ভবভূতি এ-মুখের দিকে ভালো করে' তাকিয়ে ত্যাখে নি বলে' সেই মুহূর্ত্তে ওকে খুব দোষ দিতে পারলুম না। তাকিয়ে দেখবার মত, সত্যি, কিছু নেই। হঠাৎ আমার মনে হ'লো, এই মেয়ে যখন থান-কাপড় পরবে, হাত থেকে খুলে ফেলবে শাঁখা, মুছবে কপালের সিঁদুর, তখন ওর সঙ্গে যেন তা মানিয়েই যাবে; বৈধব্যের কোনো কষ্ট অনুভব করবার ক্ষমতাও ওর নেই; ওর জীবনের এই অসাময়িক, কুশ্রী পরিসমাপ্তি ও অনায়াসে মেনে নেবে—মোট কথা, এখনকার চাইতে যে কিছুমাত্র খারাপ থাকবে, তা নয়।

ভবভূতি ক্ষীণস্বরে বললে, 'বোসো।'

হঠাৎ, কী ভাবছিলাম, তা টের পেয়ে নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পেলাম। ঘরের মধ্যে একটামাত্র চেয়ার; সেটা টিনের, এবং তা'র উপর কতগুলো নোঙ্‌রা কাপড় স্তূপীকৃত। সমস্ত ঘর এলোমেলো, বিশৃঙ্খল; পানের ডিবে থেকে আরম্ভ করে' মুদিদোকানের কাগজের ঠোঙা পর্য্যন্ত কাজের ও অকাজের নানা-রকমের জিনিস মেঝে-ময় ছড়ানো; তা'রই মধ্যে এক উলঙ্গ শিশু হাত-পা ছড়িয়ে বসে' কাল্পনিক এক সঙ্গীর কাছে ও ছাড়া অন্য সবার কাছে অর্থহীন কথা বলে' যাচ্ছে।

বৌটি নোঙ্‌রা কাপড়গুলো নামিয়ে চেয়ারটা আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে' গেলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো, ভবভূতি?'

ভবভূতি মাথা নাড়লে।—'ভালো না।'

'কী হয়েছে?'

'জ্বর।'

'ক'দিন যাবৎ ভুগছো?'

'আজ তেইশ দিন।'

'হুঁ।' একটু সময় আমি চুপ করে' রইলাম—'আপিস?'

'একমাসের ছুটি পাওয়া গেছে। সামনের দশ তারিখে join করবার কথা। কিন্তু জ্বরটা কিছুতেই যে ছাড়ছে না। ভাবছি—আরো ছুটি চাইলে দেবে তো?'

আমি কোনো কথা বললাম না। ভবভূতির অন্তহীন ছুটি মঞ্জুর হ'য়ে আছে, তা বুঝতে পারলে আপিসের ছুটির কথা ভেবে ও বিচলিত হ'তো না।

কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটায় ঢেকে ভবভূতির মা এলেন। তাঁর কাছ থেকে রোগের ও চিকিৎসার সব বিবরণ শোনা গেলো। অনেকদিন যাবৎই ভবভূতির খুস্‌খুসে কাশি, বিকেলের দিকে সামান্য জ্বরও হয়। একাদশী আর পূর্ণিমা-অমাবস্যায় উপোস করে' ও সেটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছে। কিছু ফল হয় নি।

কাশিটা বরং দিন থেকে দিন বেড়েই চলেছে। শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়তে লাগলো, হাঁটতে কষ্ট হয়। শেষ পর্য্যন্ত শয্যা নিতে হ'লো। পাড়ায়ই থাকেন এক কবিরাজ, তাঁর, আমার মনে হ'লো, সব চেয়ে বড় গুণ এই যে তিনি ভবভূতিদেরই দেশের লোক; তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেছেন, বিশেষ-কিছু নয়; ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, কাশির সঙ্গে যে-রক্তটা পড়ে, সেটা বেশি কাশতে গলায় চোট লাগে বলে'। তাঁর নির্দ্দেশ-অনুসারে চ্যবনপ্রাশ আর সকালে-বিকেলে তুলসী-পাতা আর মিশ্রীর অনুপান দিয়ে বড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। কবিরাজটির হাত-যশ আছে; ভগবানের ইচ্ছায় বাছা এখন শিগগির সেরে উঠলেই হয়।

ভবভূতির অসুখটা যে যক্ষ্মা, এবং যক্ষ্মারও বেশ-একটু পরিণত অবস্থা, তা, এ-সব বিষয়ে যা'র কিছু অভিজ্ঞতাও আছে, সে একবার ওকে চোখে দেখেই বুঝতে পারে। টিউবার্ক্‌ল্‌-বীজাণু যে ওকে আক্রমণ করবে, তাতে কিছুই আশ্চর্য্য নেই; বরং যে-সব কারণে তা শরীরের মধ্যে প্রবেশ ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তা'র প্রত্যেকটি ও অতিরিক্ত মাত্রায় পরিপূরণ করে' এসেছে। বলা যায়, যক্ষ্মার জন্য ও নিজকে সযত্নে প্রস্তুত করে' রেখেছিলো—তা ছাড়া ওর উপায় ছিলো না। এই গলির ভিতর স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার এই ঘর, অপর্য্যাপ্ত, সারহীন আহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম—

এতেও যদি ক্ষয়রোগ না হয় তো সেটা একটা মির‍্যাক্‌ল্‌। এখন যা অবস্থা, ভবভূতিকে তা'তে মৃতের মধ্যে গণনা করলেও ক্ষতি নেই। অথচ, এখন পর্য্যন্ত চ্যবনপ্রাশের উপর নির্ভর করে' এরা সবাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু মন্দই বা কী? তা-ই বা মন্দ কী? যে-কোনো অবস্থায়, ভবভূতি মরবেই ; স্বগ্রামীয় কবিরাজের চিকিৎসা ওর এমন-কী আর ক্ষতি করতে পারবে? অন্তিম, ভয়ঙ্কর উপলব্ধি একদিন তো অনিবার্য্যরূপে আসবেই—কেন সেটাকে অযথা এগিয়ে দেয়া? শিগগিরই সেরে উঠবে, এ-বিশ্বাসে যতদিন ওরা সুখে থাকতে পারে, থাক্‌ না। কী লাভ হবে ওদের জানিয়ে দিয়ে যে ভবভূতির ব্যাধিটা হচ্ছে যক্ষ্মা এবং ওর মৃত্যু আসন্ন? এ হচ্ছে গিয়ে বড়লোকের রোগ ; অকৃপণভাবে অজস্র টাকা খরচ করতে না পারলে সেরে ওঠবার লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই : ভালোই তো, ওদের যদি ধারণা হয় যে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। কী হবে, আমি যদি একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসি? ডাক্তার এসেই তো বলবে, আশিটা ইন্‌জেক্‌শন দেয়া দরকার ; তা'র একটার দামই ভবভূতির একমাসের মাইনে। তখন? বলবে, গোপালপুর-অন্‌-সী নিয়ে যাও—তখন? খেতে বলবে ডিম, দুধ, মাখন, লুচি, মাংস, অজস্র ফল—তখন? না, না—ডাক্তার না-ডাকাই ভালো ; কেন মিছিমিছি মন-খারাপ করা? টাকার অভাবে, স্রেফ টাকার অভাবে একটা লোক মরতে বাধ্য হচ্ছে, এ-চিন্তা ঘনিষ্ঠভাবে

সম্পর্কিত কারো কাছে অসহ্য, বাইরের লোকের কাছেও প্রীতিকর নয়। সেই প্রায়ান্ধকার, বিশৃঙ্খল ঘরে বসে' ভবভূতির মা-র অজ্ঞান, স্নেহান্ধ, মিথ্যা-আশা-অবলম্বী কথা শুনতে-শুনতে আমার ভয়ানক মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। কয়েকদিনের মধ্যেই ভবভূতি যে-ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেয়ে-পেয়ে মরবে, সেই চিন্তায় আমি স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম না। কিন্তু বৃথা চিন্তা; আমি কী করতে পারি? কী ক্ষমতা আমার আছে?

সন্ধে হ'য়ে এলো। 'একটা আলো নিয়ে আসি', বলে' ভবভূতির মা ভিতরের ঘরে চলে' গেলেন। হঠাৎ, ভবভূতির সঙ্গে একা বসে' আমি কী-রকম দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লাম; ওর দিক থেকে রইলাম মুখ ফিরিয়ে। সেই শিশুও কখন তা'র কাল্পনিক (কিন্তু যা'কে আমরা বাস্তব বলি, তা'র চেয়ে কিছু কম সত্য নয়) বন্ধুর সঙ্গে আলাপে ক্লান্ত হ'য়ে তা'র মা-র কাছে চলে' গেছে; স্তব্ধ ঘরে ভবভূতির দীর্ঘ, কষ্টকর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম।

খানিক পরে ভবভূতি ডাকলো: 'রামতনু।'

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

'শোনো', তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভবভূতি বললে তা'র মনের কথা, 'অসুখটা করে' এমন বিশ্রী হ'লো; নতুন একটা উপন্যাস লিখছিলাম—লিখতে পারলে অ্যাদ্দিনে শেষ হ'য়ে যেতো।'

আমি কণ্ঠস্বরে প্রফুল্লতা আনবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে' বললাম, 'এমন আর তাড়া কী? সেরে উঠে তুমি অনেক উপন্যাস', কথাটা আমার নিজের কানেই ঠাট্টার মত শোনালে, 'শেষ করতে পারবে।'

'এ-বইটা খুব ভালো হচ্ছিলো; আমার সব চেয়ে ভালো।'

'না, না', আমি মিথ্যার উপর মিথ্যা জড়ো করতে লাগলাম, 'এখন আর তোমার কী হয়েছে? সবে তো সুরু; তোমার যা সব চেয়ে ভালো, এখনো তা'র অনেক দেরি।'

কোটর-নিহিত ভবভূতির চোখে ক্ষণিকের আনন্দ ঝিক্‌মিক্ করে' উঠলো।—'শুয়ে-শুয়ে প্রায়ই বইটার কথা ভাবি। এমন লিখতে ইচ্ছে করে!'

দিনব্যাপী অপিসের খাটনির পর বাড়ি ফিরে এসে আবার লেখা—বোধ হয় এই তক্তপোষেই বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে—অবিশ্রান্ত লেখা—সে-লেখায় যশ নেই, লাভ নেই, বাইরে থেকে কোনোরকম উৎসাহ নেই, তবু মুহূর্তের জন্য দমে' না গিয়ে লিখে যাওয়া—কী আশ্চর্য্য, কী ভয়ানক! হঠাৎ আমার মনে হ'লো, এই লেখার জন্য না হ'লে ভবভূতির হয়-তো অসুখটা করতোই না। এত পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে ও জন্মায় নি। যদি সন্ধেবেলাটাও ও খোলা হাওয়ায় কাটাতো! কিন্তু তখনই আবার মনে হ'লো, এই ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার ও কোনো-

রকমেই পেতো না ; তবু যা হোক এই সান্ত্বনা নিয়ে ও মরতে পারবে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ওর সাহিত্যসৃষ্টি থাকবে ক্ষয়হীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ; ও অন্তত জেনে যাবে, ওর জীবন একেবারে ব্যর্থ হয় নি।

কিন্তু সব জেনে-শুনেও মনকে একেবারে পাথর করা গেলো না—করতে হ'লো চিকিৎসার ভাণ। সে-ভাণ একদিক থেকে যেমন হাস্যকর, অন্যদিক থেকে তেমনি মর্ম্মান্তিক। আমার পক্ষে তা'র মর্ম্মান্তিকতা দ্বিগুণ : কেননা তা আমার এমনিতেই শূন্য হ'য়ে যেতে উৎসুক পকেটকে দ্রুততরোভাবে শূন্যতরো হ'তে সাহায্য করেছিলো। দাক্ষিণ্যের প্রতি কোনোরকম উন্মুখতা আমার কখনো ছিলো না ; সেটা একটা বিলাসিতা যা সত্যি, আমার অতীত। আমার নিজের অস্তিত্বই যা'কে বলে গিয়ে হাত থেকে মুখে। যে-আমার কখনো কোনো কঠিন অসুখ করলে সোজা হাসপাতালে গিয়ে ওঠা ছাড়া উপায় থাকবে না, সেই আমাকেই এমন একজনের জন্য বাড়িতে লুকিয়ে ডাক্তারের ফীর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে যা'কে, সত্যি বলতে, আমি ভালোও বাসি নে। ব্যাপারটায় মনে-মনে একটু রাগও হ'লো, হাসিও পেলো। একেই বলে কপাল।

কলকাতায় ভবভূতির আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিলো না, জানতুম ; বাইরে কেউ আছে কিনা, খোঁজ নেবার সময় ছিলো না—এবং

এমন সন্দেহ করি যে খোঁজ নিলেও বিশেষ-কিছু ফল হ'তো না। প্রত্যেকেই নিজের জীবন নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত—অন্যের দিকে তাকাবার সময় কা'র আছে? তা ছাড়া ভবভূতির পারিবারিক ইতিবৃত্ত যদ্দূর জানতুম, ওর কোনো আত্মীয়র যে ওর মৃত্যুর মুহূর্তে ওর কর্ণমূলে হরিনাম জপ ছাড়া (তাও খুব সোৎসাহে, উচ্চস্বরে নয়) আর-কিছু করবার ক্ষমতা আছে, তা সম্ভব মনে হয় নি। আর তা ছাড়া, আত্মীয় বলতে সাধারণত যাদেরকে বোঝায় তা'রা হচ্ছে এক শ্রেণীর জীব যা'রা আপনার মৃত্যুতে শোক করতে সব সময়ই এত বেশি প্রস্তুত হ'য়ে আছে যে সে-মৃত্যু নিবারণের উদ্দেশ্যে কোনোরকম চেষ্টা করবার খেয়াল তাদের হয় না।

সুতরাং আমাকেই পরদিন শহরের এক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞকে নিয়ে যেতে হ'লো আমার বন্ধুকে দেখতে। রোগীর পরীক্ষা খুব সংক্ষিপ্ত হ'লো: পরীক্ষা করবার বিশেষ-কিছু ছিলো না। ডাক্তার বেরোবার সময় আমাকে ইঙ্গিত করলেন। একটু সময় নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে হাঁটলুম। বাই-লেনে ডাক্তারের গাড়ি ঢোকে নি; অপেক্ষাকৃত চওড়া গলিতেও সমস্তটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। গাড়ির পা-দানিতে এক পা রেখে কোটের পকেট থেকে তিনি সোনার সিগ্রেট-কেইস বা'র করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'Clean case of tuberculosis'.

কথাটা শুনে রোমাঞ্চ হ'লো। যেন এ-খবরটা জানবার

জন্যেই একটা গল্পের সম্পূর্ণ উপার্জ্জন তাঁকে দক্ষিণা দিয়েছি। মুখে বললুম, 'তা জানি। এখন কী করতে হবে বলুন।'

এর পরে ডাক্তার সিগ্রেট ধরিয়ে কতগুলো পারিভাষিক শব্দ-বহুল কথা বললেন। মুগ্ধ হ'য়ে আমি শুনতে লাগলুম—এবং দেখতে লাগলুম। লোকটি বেঁটে, মোটা এবং গৌরবর্ণ। মাথার চুল জর্ম্মানদের মত ছোট করে' ছাঁটা। ছোট-ছোট নীল্‌চে চোখ ; ব্লণ্ড্ একটুখানি গোঁফ। গাল দুটি আপেলের মত টুক্‌টুক্ করছে। নিখুঁত নখগুলো যেন রক্তে ফেটে পড়ছে। সব জড়িয়ে তাঁর অতি-প্রিয় ক্যাল্‌শিয়মের জীবন্ত বিজ্ঞাপন। কথা বলতে-বলতে তাঁর বুকের সোনার চেন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো ; স্ফীততরো ও রক্তিমতরো হ'য়ে উঠতে লাগলো তাঁর গণ্ডদেশ।

সব শুনে আমি বললুম, 'কিন্তু এখন কি কিছু করবার আছে?'

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।—'ট্রিটমেণ্ট্ অবিশ্যি করতে হবে—ক্যাল্‌শিয়ম্ ইন্‌জেক্‌শন—তা ছাড়া আর-কোনো ওষুধ নেই। আর যে-সব নিউ-ফ্যাঙ্গ্‌ল্‌ড্ ট্রিটমেণ্ট্ বেরিয়েছে—'

আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলুম, 'ইন্‌জেক্‌শন কি অনেক-গুলো দিতে হবে?'

'সে এখন কী করে' বলি। কিন্তু', ডাক্তারবাবু কথাটার গুরুত্ব স্ফুটতরো করবার জন্য মোটা, শাদা আঙুল দিয়ে তাঁর কোটের বোতামের উপর তিনবার টোকা দিলেন, 'কিন্তু সবার

আগে দরকার এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া।' তিনি ঘোরতর অসমর্থনসূচক দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকালেন, 'এ-রকম রাস্তার উপর এ-রকম বাড়িতে বাস করলে যক্ষ্মা না হওয়াই যে আশ্চর্য্য।'

আমি চুপ করে' রইলুম। এ-রকম রাস্তা এবং তা'র উপর এ-রকম বাড়ি থাকতে দেয়াই যে অন্যায়, কিন্তু যতদিন তা থাকে, কোনো-না-কোনো মানুষ সেখানে বাস করবেই, এ-প্রসঙ্গ ধরে' সে-সময়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সমাজনৈতিক তর্ক করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হ'তো।

'হ্যাঁ', ডাক্তারবাবুর ক্যাল্‌শিয়ম-পুষ্ট গণ্ডদেশে ঘাম চিক্‌চিক্ করছিলো, রুমাল দিয়ে একবার মুখটা মুছে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'আসল কথা হচ্ছে এ-বাড়ি ছেড়ে যাওয়া, কলকাতার বাইরে যাওয়া। নয় তো', সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে তিনি জুতোর নিচে মাড়িয়ে দিলেন, 'কিছুই এঁকে বাঁচাতে পারবে না—nothing on earth. Nothing on earth'. গম্ভীর, এমন কি একটু ঝাঁকালো গলায় তিনি আবার বললেন। 'বাই দি ওয়ে, আপনি রোগীর কে হন্?'

'ও আমার—এই, ও আমার বন্ধু আর কি।'

'ও, ফ্রেণ্ড্।' ডাক্তারবাবু একটু যেন সন্দিগ্ধচোখে আমার দিকে একবার তাকালেন, 'তা শিগগিরই ব্যবস্থা করে' ফেলুন।

Lose no time. গোপালপুর-অন্-সী আজকাল খুব ভালো, ফ্রেশ্ জায়গা, বেশি রোগীর আমদানি হয় নি এখনো। আমার অনেক পেশেণ্ট্ গোপালপুর গিয়ে ভালো হয়েছে। I never recommend Puri. It had had too much of T. B. in its time. হ্যাঁ, গোপালপুর। বেশ ভালো দেখে একটা বাড়ি নেবেন—একেবারে সমুদ্রের উপরে হ'লেই ভালো। Ozone. Ozone is life. ঘাব্‌ড়াবেন না, আপনার বন্ধুর সেরে ওঠবার চান্স্ই বেশি—এর চেয়ে অনেক খারাপ কেইস আমি সারিয়েছি—but lose no time. এ-উইকের মধ্যেই দু'টো ইন্‌জেক্‌শন দেবো—প্রথমটায় আঠারোটা দিলেই যথেষ্ট, আর তা'র পরেই—' ডাক্তারবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। 'And make him feel happy in whatever way you can. Nothing like happiness to cure consumption.…আচ্ছা, কাল একবার আসবেন। বাড়িতে আমার আওয়ার্স্ হচ্ছে সেভেন টু নাইন ইন্ দি মর্নিং।'

আমি ফিরে যেতে ভবভূতির মা—বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে নয়—জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বললে ডাক্তার?'

আমি বললুম, 'আপনারা কিছুদিন না-হয় ওকে নিয়ে দেশে গিয়ে থাকুন না। ডাক্তার বললে, কিছুদিন খোলা হাওয়ায় থাকলেই সেরে যাবে।'

'দেশে গিয়ে কোথায় থাকবো বাবা', ভবভূতির মা যেন একটু বিরক্তই হলেন, 'বাড়ি-ঘরের যা অবস্থা। যদ্দিন না বিভুর চাকরি হয়েছিলো, ছিলুম আর কি কোনোরকমে। এখন আবার কে ফিরে যেতে চায় সেই সাপ-খোপ জঙ্গলের মধ্যে, বলো। তা ছাড়া বয়েস হয়েছে, কবে চোখ বুজি ঠিক নেই, গঙ্গা ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।'

তিনি যে-পুণ্যের লোভে বসে আছেন তা যে তাঁর পুত্রের কপালেই আগে জুটবে, সে-খবরটা গোপন করে' বললুম, 'ডাক্তার বলছিলো দেশে-গাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকলেই—'

'ওঃ, রেখে দাও ডাক্তার-ব্যাটাদের কথা। অমন দুটো-চারটে বোলচাল না ঝাড়লে ওদের ব্যবসা চলবে কেন? দেশে গিয়ে থাকো! এদিকে চাকরিটি যে মাথায় উঠবে, তা'র কী হবে শুনি? ডাক্তার দেবে চাকরি? খামোকা তুমি ডাক্তার-ফাক্তার ডাকিয়ে অত হাঙ্গামা করতে গেলে। আমি কালই কালিঘাট গিয়ে নৈবিদ্যি ফুল এনে ওর মাথায় দেবো—এখন শিগগির-শিগগির ও আবার চাকরিতে যেতে পারলেই হয়।'

কালিঘাটের ফুলই, তা হ'লে। হোক্, কালিঘাটের ফুল যতক্ষণ শান্তি দিতে পারছে, তা-ই বা মন্দ কী? আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি নিয়ে তো তা পারি নে।

তবু একেবারে ছেড়ে দেবার আগে, নেহাৎই নিজের স্বভাবের

দোষে একবার যাদবপুরে চেষ্টা করলুম। সেখানে তিনটিমাত্র বিনিপয়সার বিছানা, সেগুলো সারা বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও ফাঁকা থাকে না। একজন রোগী মরবার কি খালাস পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একজন জায়গা নেয়; অনেকদিন আগে থেকেই দরখাস্তর তাড়া অপেক্ষা করতে থাকে। অসম্ভব।* আর পয়সা দিয়ে? সে আরো বেশি অসম্ভব।

এর পর আর-কিছু করবার রইলো না। দিন কেটে যেতে লাগলো। দিনের পর দিন, সেই স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার একতলার ঘরে, একটু-একটু করে', স্পষ্ট, প্রত্যক্ষভাবে ভবভূতি মরতে লাগলো। উপলব্ধি করলুম, ওর শরীরের আরামের চাইতে এখন আত্মার শান্তির চেষ্টা করাই বেশি বিবেচনার কাজ।

শয্যাগত অবস্থায় ওর প্রায় দু' মাস কেটে গেলো। ছুটি আর টানা যায় না, ছাড়ানপত্র এলো আপিস থেকে। ভবভূতির মা শোকে আকুল হলেন। আমি তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে' বললুম যে ও একবার ভালো হ'য়ে উঠলে এমন অনেক চাকরি ইত্যাদি। বৌয়ের গায়ে সামান্য যা গয়না ছিলো, যেতে আরম্ভ করলো। নিজের উপর স্রেফ ডাকাতি করে' আমি খুচরো এটা-ওটা চালাতে লাগলুম। কী আশ্চর্য্য, মনে-মনে আমি বললুম, ওর পরিবারকেও সর্ব্বস্বান্ত না করে' কি ও ছাড়বে না? এইবার শেষ হ'য়ে গেলেই তো পারে। ও মরে' গেলে ওর পরিবারের কী

অবস্থা হবে তা ভাববার সাহস আমার কখনো হয় নি। সবটারই সীমা আছে।

একদিন ভবভূতি বললে, 'তোমার কী মনে হয় রামতনু, আমি বাঁচবো না?'

'এ-সব কথা তোমার মাথায় ঢোকায় কে?' আমি হাসবার চেষ্টা করলুম।

'না, না, আমার কাছে লুকোচ্ছো কেন? আমি বুঝি, সবই বুঝি। আর বেশিদিন আমি নেই।' ভবভূতি চোখ বুজে একটু চুপ করে' রইলো। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, 'কিন্তু, রামতনু, মরবার আগে আমার একখানাও যদি বই বেরুতো!'

'সে-জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আগে ভালো হ'য়ে ওঠো, তারপর—'

'যদি ভালো না হই? মরবার পর আমার লেখার কী হবে আর না হবে তা তো আমি দেখতে আসবো না। তা'র আগে তুমি যে-কোনোরকম করে' একখানা বই কি বা'র করে' দিতে পারো না?' মুমূর্ষুর দৃষ্টির সমস্ত ক্লান্ত করুণতা আমার মুখের উপর এসে নিহত হ'লো।

তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিয়ে আমি বললুম, 'কী যে তুমি বলো তা'র ঠিক নেই। অবিশ্যি তুমি যদি চাও আমি আবার চেষ্টা করে' দেখতে পারি—'

'ত্যাখো না, তা-ই একটু ত্যাখো না। এবার হয়-তো হ'য়েও যেতে পারে। আমার একটা বইও যদি ছাপা হ'য়ে বেরিয়েছে, দেখতে পেতুম—' নিছক শারীরিক ক্লান্তিতে ও কথাটা শেষ করতে পারলে না।

'আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে'', আমি বলতে বাধ্য হলুম। ওর কণ্ঠস্বরে মিনতির যে-অপরিসীমতা ছিলো তা সহ্য করা কোনো রক্ত-মাংসের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর সত্যি-সত্যি, সেদিন ওর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হাতে করে' নিয়ে এলাম এক পাণ্ডুলিপি—ও নিজেই সেটা বেছে দিলে (ওর সমস্ত রচনাস্তূপ ভাঙা, ডালাহীন একটা পোর্ট্‌ম্যাণ্টোয় ঠাসা হ'য়ে ওর তক্তপোষেরই এক পাশে থাকতো—ওর হাতের কাছে: এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও যখনই একটু সজীব বোধ করতো, সেগুলো দেখতো নাড়াচাড়া করে')।

পরদিন গিয়ে আমি হাসিমুখে বললুম, 'শুভ-সংবাদ।'

'নিয়েছে ?' ভবভূতির সমস্ত মুখে এক আশ্চর্য্য দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো। সেই মুহূর্ত্তে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সার্থক মনে হ'লো আমার এতদিনকার নির্লজ্জ নির্ম্মম প্রতারণা। 'নিয়েছে ?' প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে তা'র গলা একটু কেঁপে গেলো, 'কে নিলে ?'

'ছোট এক পাব্লিশর', আমার সব উত্তর প্রস্তুত ছিলো, 'এখন কিছু দিতে পারবে না, বললে—লাভের আদ্ধেক—'

'তা হোক্, তা হোক্', ভবভূতির জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, দ্রুত, অনিয়মিত, কথাগুলো যেন দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে বেরুচ্ছে তা'র মুখ থেকে, 'লাভ আমি আশাও করি নে। বই তা হ'লে ওরা বা'র করছে, সত্যি-সত্যি করছে? কবে করবে?'

'এই, পূজোর আগেই', অনায়াসে আমি বললুম, কেননা ভবভূতি যে পূজো অবধি টিঁকবে, সে-সম্ভাবনা খুবই কম বলে' জানতুম।

তারপর এলো কয়েকটা মত্ত জল্পনার দিন—বইয়ের চেহারা কেমন হবে, কী রঙের হবে মলাটের কাপড়, পিছনে সোনার জলে নাম লেখার দস্তুর আজকাল আছে কি নেই, বইয়ের নাম আর পৃষ্ঠাসংখ্যা কোন্‌খানটায় কী-রকম করে' বসালে একেবারে অভূতপূর্ব্ব হয়—ইত্যাদি আর ইত্যাদি। তারপর বই বেরোলে পরে আমার কোন্ সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে কোন্ কাগজে রিভিউ করানো যায়, সমালোচনাগুলোর শ্রেষ্ঠাংশ চয়ন করে' কোনো কাগজে একটা বিনিপয়সার বিজ্ঞাপন চালিয়ে দিতে পারবো কিনা, প্রকাশকই বা কী-রকম করে' বিজ্ঞাপন দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বইয়ের নামটা ঠিক হ'লো তো? গোড়ায় একটা ভূমিকা লিখে দিলে কেমন হয়? অগ্রিম কতগুলো মতামত সংগ্রহ করে' জ্যাকেটের উপর ছেপে দিলে মন্দ হয় কী? আমি অবিশ্রান্ত

পরামর্শ দিলুম, আশ্বাস দিলুম, প্রতিবাদ করলুম। বইখানা যে আমার নামেই উৎসর্গীকৃত হবে এই সম্মানও আমি গ্রহণ করলুম যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে। এমন কি, উৎসর্গ-লিপিও আমার অজ্ঞাত রইলো না। ও আমাকে একদিন ছোট্ট এক টুকরো কাগজ দেখালে। তা'তে লেখা :

'বঙ্গের সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,

বহুদূরবিস্তারী যশের অধীশ্বর,

অতুলনীয় লেখনীর অধিকারী,

নিরহঙ্কার, নির্ম্মলচিত্ত,

স্নেহময়, হৃদয়বান,

আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু

শ্রীরামতনু মজুমদারকে

আমার এই দীন প্রচেষ্টা

উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।'

এ-লিপি কখনো প্রকাশিত হ'লে গলায় দড়ি দিতে হ'তো; সে-সম্ভাবনা নেই বলে'ই ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলাম। মুখে বললাম, 'এত কী লেখবার দরকার ছিলো।'

'না, না', ভবভূতি আকুলস্বরে বলে' উঠলো, 'থাক্, এই থাক্। আরো কত লেখবার ইচ্ছে ছিলো—তুমি জানো না। এটা তুমি কালই দিয়ে এসো প্রকাশককে।'

এই কাগজের টুকরোটা এখনো আমার কাছে আছে। আমার বন্ধুর এই একমাত্র স্মৃতি। (উপন্যাসের সেই পাণ্ডুলিপিটা —যথাসময়ে, অলক্ষিতে সেই শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিলো যেখানে সব মৃত, লুপ্ত জিনিস রাশীকৃত।) এই অদ্ভুত সাহিত্য-খণ্ডের দিকে তাকাতে গেলে আমি কষ্ট অনুভব না করে' পারি নে। লেখা হিসেবে এটা নির্ব্বুদ্ধিতার একটা দৃষ্টান্ত, কিন্তু এর আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার উপায় নেই। কিন্তু শুধু আন্তরিকতার জোরেই যদি আর্টে পৌঁছনো যেতো তা হ'লে পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রেম-পত্র এমন অসম্ভবরকম ক্লান্তিকর হ'তো না। তবু—এই হাস্যকররকম অতিরঞ্জিত, জমকালো, প্রায় বর্ব্বর লেখার ভিতর দিয়ে ভবভূতি কিছু-একটা বলতে চেয়েছিলো—এটা ঠিক যে কিছু বলতে চেয়েছিলো। 'আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—' কথাটা এখন প্রায় ঠাট্টার মত শোনায়। বোধ হয় এটাই ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা।

যা-ই হোক্, প্রতিদিন ওর কাছে বসে'-বসে' ওর মুদ্রাকরস্থ উপন্যাসের সমস্ত খুঁটিনাটি-বৃত্তান্তের বিবৃতি দিয়ে যেতে লাগলুম। যে-আগ্রহ নিয়ে ও আমার কথাগুলো গিলতো তা একটা দেখবার জিনিস; অনুভূতির অমন প্রখরতা ওর মধ্যে সম্ভব তা আমি

কখনো ভাবি নি। প্রুফ আমিই দেখছি। তবে এখন বাঙ্‌লা-দেশে বই বেরোবার মৈশুম—সব প্রেসেই ভীষণ কাজের চাপ, আস্তে-আস্তে হচ্ছে। তবে হ'য়ে যাবে—পূজোর আগেই হ'য়ে যাবে। একেবারে বাঁধানো, ঝক্‌মকে, হট্‌-প্রেসের ইস্ত্রি-করা আনকোরা বই ও হাতে পাবে—ওর নিজের বই। বিজ্ঞাপন যাবে সামনের মাস থেকে। শুনতে-শুনতে ভবভূতি মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো—দীর্ঘ পথের শেষ হ'লো, এতদিনে, এতদিনে বুঝি সময় এলো তা'র। দেখতে পাচ্ছে সে চোখের সামনে সন্ধ্যার সোনায় উদ্ভাসিত কোনো অদৃষ্টপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য শহরের মত সাহিত্যিক যশের জ্যোতির্লোক। এ-কথা মনে করে' এখনো আমার তৃপ্তি হয় যে সেই শেষের ক'টা দিন আমি ওকে সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে সুখী করতে পেরেছিলাম। অমন সুখী জীবনে ও কখনো হয় নি। আর সেই আনন্দের উদ্দীপনায় ও যেন সত্যি-সত্যি ভালো হ'য়ে উঠতে লাগলো। যক্ষ্মা সারাতে আনন্দের মত কিছু নয়—বিশেষজ্ঞের এই কথার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে চমৎকৃত হ'লুম। এক সময় আমার এমনও আশা হয়েছিলো যে শেষ পর্য্যন্ত—কে জানে, কিছুই বলা যায় না—ভবভূতি হয়-তো সেরেও উঠতে পারে। ও-রকম নাকি অনেক সময় হয়, শোনা গেছে।

বলা বাহুল্য, সে-মোহ বেশিক্ষণ টি`কলো না। যেন ওর শরীরের রোগটাই ক্লান্ত হ'য়ে একটু বিশ্রাম করে' নিচ্ছিলো।

তারপর নির্দ্দিষ্ট ও অনিবার্য্য দিকে মোড় ফিরলে। বুঝতে পারলুম, আমার বন্ধুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলুম : আর-কিছু করবার ছিলো না।

তবু—মনে-মনে আমি বললুম—ও মরবে সুখী হ'য়ে, সেটাই বা কী কম? ওর এই সুখ থেকে আমি ওকে ভ্রষ্ট করতে যাবো কেন? না, আমি তা হ'তে দেবো না, হ'তে দেবো না। আর, কী সহজ ওকে সুখী করা—শুধু মুখের কয়েকটা কথা, কয়েকটা —লোকে বলবে—মিথ্যা। মিথ্যা—কিন্তু ওর মনে যদি তা-ই সত্য হ'য়ে উঠে' থাকে, তা হ'লে তফাৎটা কোথায়? ও যদি মনে-মনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে থাকে মৃত্যুহীন মহিমায়—একই তো কথা। আপনাদের সব চেয়ে কৃতী, সব চেয়ে যশস্বী যে-বীর, তা'র নামের পাষাণ-লেখন—তা-ও যে একদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে না যাবে—তা কে বলবে? না, একই কথা। ভবভূতিও তা'র চরম চরিতার্থতার অংশ পেয়েছিলো বই কি—মৃত্যুর প্রান্তদেশে এসে। সে-ও তা'র জীবনকে জয় করতে পেরেছিলো —মৃত্যুর মুখোমুখি। ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলো আনন্দের অংশ, তা'রও এসেছিলো রঙিন, ক্ষণিক দিন। স্বপ্ন? হ্যাঁ, স্বপ্নই তো; কিন্তু স্বপ্ন সত্য নয় এ-কথা আপনাদের কে বললে? কল্পনাও একটা অভিজ্ঞতা : এবং অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার চাইতে অনেক বেশি জীবন্ত, অনেক বেশি প্রখর। কেননা কল্পনাই

চিরন্তনতা। বাস্তব সঙ্কীর্ণ, বাস্তব ঘটনা ও সময়ে সীমাবদ্ধ, বাস্তব অসম্পূর্ণ; কল্পনা অসীম ও চিরন্তন। হ্যাঁ, স্বপ্ন। মনে করুন এই আমাদের জীবন—আমাদের সব কথা আর চিন্তা আর চেষ্টা—মনে করুন এ-সব কোনো বৃহত্তর সত্তার নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন—তা হ'লে আমরা কোথায় থাকি? সেই স্বপ্ন যদি কখনো ভেঙে যায়—তা হ'লে? এমন যদি হয় যে কোনো কালহীন, কাল-অতীতের ভাবনা দিয়ে এই বিশ্ব তৈরি, তা হ'লে আমরা—যা'রা মাংসের দেয়ালের, সময়ের শৃঙ্খলের মধ্যে বন্দী—আমরাই বা নিজেদের অনুপাতে, নিজেদের ভাবনা দিয়ে নিজস্ব, গোপন বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারবো না কেন? আর সে-বিশ্ব যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, তা'তে কি কিছু এসে যায়? তা তো একজনের পক্ষে সত্য হবারই জন্যে। না, আমাদের ভাবনাই সব: আমরা যা ভাবতে পারি, আমরা তা-ই। এ-কথা ভেবে আমার তো ভালো লাগে যে ভবভূতি—জীবন যা'কে দিয়েছিলো শুধু দীনতা আর গ্লানি—আর অতি ক্ষুদ্র, ধূলিময় সব দুঃখ, তা'র মৃত্যু হ'য়ে উঠেছিলো কল্পনায় জ্যোতির্ম্ময়। যা'র জীবন ছিলো একটা অর্থহীন শূন্যতা, তা'র মৃত্যুর পথ সোনা-ছড়ানো, স্বপ্নের সোনা-বসানো। সবদিক ভেবে দেখতে গেলে, সেটা কম সৌভাগ্য নয়। শেষ পর্য্যন্ত, হঠাৎ দেখতে যা মনে হ'তে পারতো অতি কুৎসিত প্রতারণা, তা-ই হ'য়ে উঠলো শ্রীময়। শেষ পর্য্যন্ত আমি আমার আচরণের জন্য অনুতাপ করি নি।

ভবভূতির মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কলকাতার আকাশ ভরে' শরৎ এসেছিলো। শাদা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলুম। কী সহজে ওরা ভেসে যায় আকাশের এক কোণ থেকে অন্য কোণে, মানুষের বাড়ি থেকে পা বাড়াতেই রেলভাড়া লাগে। সে-বছর আমার রেলভাড়ার কম্‌তি পড়েছিলো—পূজোর হিড়িকে যা-কিছু বাড়তি উপার্জ্জন, সব আমার বন্ধুর কৃপায় হাতে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছিলো। পূজোর সময়টা কলকাতায় বসে'-বসে' ভাগ্যকে শাপ দিয়েছিলুম। বালক-কালের চিন্তাহীনতায় আমি আর ভবভূতি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা বন্ধু থাকবো। কবেই বা তা বলেছিলুম আর কবে ভুলে' গিয়েছিলুম কিছুই মনে ছিলো না: কিন্তু ভাগ্য যে তা অমন নির্ম্মমভাবে মনে করে' রাখবে তা কখনো ভাবতে পারি নি। কী দরকার ছিলো, কী দরকার ছিলো এ-সমস্তর? কিন্তু কেন যে আমাদের জীবনে ও-রকম না হ'য়ে এ-রকম হয়, তা আমরা বলতে পারি নে। আমরা শুধু দুঃখভোগ করতে পারি, শুধু প্রতিবাদ করতে পারি। কিন্তু ঘটনার জটিল জাল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে' নিতে পারি নে কিছুতেই। ভবভূতির জন্য কিছু ব্যয় করছি, এতে আমার নিজেরই এক-এক সময় অবাক লাগতো। এ আমি করছি কী? এর চেয়ে মূঢ় অপব্যয় আর কী হ'তে পারে? ভবভূতি যে মরবে এ তো নিশ্চিত—

তা'কে বাঁচানো আমার এই অতি-পরিমিত আয়ের তলানির সাধ্য নয়। তা ছাড়া, সত্যি বলতে, ভবভূতি এমন মানুষ নয় যে মরলে কি বাঁচলে খুব কিছু এসে যায়। মাঝখান থেকে আমি কেন নিজের উপর এই অত্যাচার করছি? ঈশ্বর জানেন, কী কষ্টসাধ্য, কী কৃপণ আমার এই উপার্জ্জন। নিজেরই কত ছোট-খাটো ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে বছরের পর বছর। আমার উপর এই দাক্ষিণ্যের ভার—এ যে দস্তুরমত রসিকতা। যে-টাকা যাচ্ছে ভবভূতির চিকিৎসারূপ প্রহসনে (বলা বাহুল্য, বিশেষজ্ঞের বিধানের শতাংশও পালন করা সম্ভব হয় নি), তা দিয়ে আনাতোল ফ্রঁসের একটা সেট্ কেনা যেতো, বেইঠোফেনের কোনো রেকর্ড—তা দিয়ে স্বাদ নিতে পারতুম কোনো দুর্লভ মদ্যের, কবিতার চরণের মত যা'র নাম, সূর্য্যাস্তের আভার মত যা'র রঙ্, আর যা'তে মশ্‌লার আর অন্ধকারের আর স্মৃতির গন্ধ। তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দু' সপ্তাহ আলস্য উপভোগ করে' আসতে পারতুম। তা দিয়ে—তা দিয়ে অনেক-কিছু করা যেতো। ও-সব জিনিস আমার দরকার। হয়-তো ও-সব আমাকে সাহায্য করতে পারে একটি সুন্দর কবিতা লিখতে।

সব চেয়ে আমার যা খারাপ লাগতো তা হচ্ছে ভবভূতির অর্দ্ধ-স্ফুট, বিসদৃশ-উচ্চারিত কৃতজ্ঞতা। ওর অত্যন্ত আন্তরিক উচ্চারণেও কেমন-যেন শ্রী ছিলো না। শুনতে অস্বস্তি লাগতো,

কষ্ট হ'তো। সে-ই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগা, যে প্রকাশ করতে জানে না। তা'র অন্তরের নিবিড়তম অনুভূতির কথাও কেউ শুনতে চাইবে না, সে ভালো করে' বলতে পারলে না বলে'। জীবনে প্রতি পদে আর্টের স্থান। আমরা স্বাভাবিকতা চাই নে, আমরা সু-অভিনয় চাই। আমরা কাঁচা মাল চাই নে, আমরা সৃষ্টি চাই। আমরা সত্যকে চাই নে, আমরা সুন্দরকে চাই। বর্নার্ড্ শ'র নাটকে অত্যন্ত সৎ, অত্যন্ত ভালো, নানারকম নৈতিক গুণ-সম্বলিত একজন লোককে মৃত্যুর মুখে ফেলে' ডাক্তাররা তা'কেই বাঁচানো ঠিক করলেন যে দু' হাতে টাকা ধার নিয়ে আর ফেরৎ দেয় না, যে তা'র স্ত্রীকে বিয়ে করে নি। এমন লোকের কথা সহজেই ভাবা যায়, যা'কে ভবভূতির অবস্থায় দেখলে তা'কে বাঁচাবার জন্য আমি পৃথিবী ওলোট-পালোট করে' ছাড়তুম। হয়-তো তা'র আর-কোনোই গুণ থাকতো না; শুধু শ'র চরিত্রের মত সে ভালো করে' কথা কইতে পারতো। ভবভূতির জন্যে আমি যদি কিছু করে' থাকি, ঈশ্বর জানেন তা ভালোবেসে করি নি: সুতরাং একাধিক অর্থে তা অপব্যয়। আর সেইজন্যই ভবভূতির কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আমার আরো বেশি অসহ্য লাগতো।

রোদে-ভরে'-যাওয়া এক সকালবেলায় আমার যেন কিছুতেই আর কলকাতায় মন টিঁকছিলো না। কোথাও যেতে পারবো না মনে করতে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলুম। ভবভূতির বিরুদ্ধে

একটা ব্যক্তিগত রাগ মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে খোঁচা দিয়ে উঠছিলো। ওকে দেখতে বাস্-এ আসতে-আসতে ওর মুখ মনে পড়লো—ওর প্রেত-মুখ। কী ভয়ঙ্কর সে-মুখ, তা যেন সেই মুহূর্ত্তে, স্বচ্ছ-নীল সকালবেলার ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে প্রথম উপলব্ধি করলুম। প্রায় লোভ হ'লো ফিরে যেতে। না, আজ নয়। আজ ওর মুখোমুখি হ'তে পারবো না। এই সকালবেলায় নয়, দিগন্ত যখন নীলের গুঞ্জনে ভরে' উঠলো। কিন্তু আমার উপর বিধাতার অভিশাপই এই যে আমি কখনো কোনো বিষয়ে চট্ করে' মন ঠিক করে' উঠতে পারি নে। বাস্ এগিয়ে গেলো; নিছক অভ্যেসের জোরে ভবভূতির রাস্তার মোড়ে নেমে পড়লুম।

কিন্তু কী খারাপ, কী খারাপই আমার লাগছিলো আলোয় উজ্জীবিত, প্রাণ-চঞ্চল রাস্তা ছেড়ে আলোহীন, আকাশহীন সেই গলিতে, শ্বাসরোধকারী, মৃত্যুময় সেই ঘরের মধ্যে ঢুকতে। আ, জীবনে সময় এত কম, এত কম—তা'র মধ্যে এমন আশ্চর্য্য একটা সকালবেলা কি নষ্ট করতে হবে, রোগের শয্যাপার্শ্বে, মৃত্যুর নিঃশ্বাস-ঘন সেই অন্ধকার ঘরে—দারিদ্র্যের কঙ্কাল যেখানে প্রদর্শিত, জীবনের ক্ষীণ বুক-ধুক্‌ধুকানি যেখানে অতি কষ্টে কান পেতে শুনতে হয়?

যেন আমার মনের ভাবকে বিদ্রূপ করে', আমি ঘরে ঢোকা-মাত্র ভবভূতি বলে' উঠলো, 'এই তো তুমি এসেছো। আমি ঠিক

জানতুম তুমি এখন আসবে।' হাসির চেষ্টায় ভবভূতির ব্যাধিক্ষত কুৎসিত মুখ আরো-একটু বিকৃত হ'য়ে গেলো।

হাতে ছিলো এক ঠোঙা কাবুলি ফল, ওর মা-র হাতে সেটা দিয়ে এসে আমি ভবভূতির কাছে বসলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে' আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ও বললে, 'তুমি আমার জন্যে যা করলে, রামতনু—'

অসহ্য। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তন করলুম, 'কেমন আছো আজ?'

'আর আছি!' ভবভূতি তা'র একখানা হাড়ময় হাত কপালের উপর তুলে দিলে।

'কাল রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলে?' আমি চেষ্টা করলুম আলাপটা এই সাধারণতার স্তরে আবদ্ধ রাখতে।

ভবভূতি মাথা নাড়লে। না, ঘুমোতে সে পারে নি। তা'র চোখ দুটো কোটরের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। তা'র জীবনী-শক্তি স্পষ্টত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতরো হচ্ছে। যাক্, বেশি দেরি নেই।

একটু পরে ও জিজ্ঞেস করলে: 'বই কদ্দূর হ'লো?'

'হচ্ছে, আস্তে-আস্তে হচ্ছে', আমার উত্তর প্রস্তুত ছিলো, 'তুমি ও-সব নিয়ে ভেবো না, এখন ভালো হ'য়ে ওঠো।'

'ভালো কি কখনো হ'বো?'

'বাঃ, কী যে বলো! তুমি ভালো না হ'লে চলবে কী করে' ?'

'আমার কিন্তু এক-এক সময় মনে হয়—'

'ওঃ, তোমার মনে হয়! ভারি তুমি বোঝো এ-সব জিনিসের।'

'তা হ'লে—এখনো তা হ'লে আশা আছে ?'

আমি হেসে উঠলুম।—'আর কয়েকটা দিন যাক্ না', বুঝতে পারছিলুম ওর মন এরই মধ্যে একটু ভালো করে' দিতে সক্ষম হয়েছি; উৎসাহিত, আমি স্থির করলুম, এ-বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ওকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করবো, 'কয়েকটা দিন যাক্ না', আমি বললুম, 'তা'র পরেই পুরী। ডাক্তার অবিশ্যি বলেছিলো গোপালপুর, কিন্তু পুরীতে কতগুলো সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে কিনা—পুরী গেলে তোমার অসুখ কোথায় থাকে, ছাখো না!'

'পুরী!' ভবভূতি বিহ্বলভাবে প্রতিধ্বনি করলে। আমার এই সঙ্কল্প ও এই প্রথম শুনলে। ওটা ছিলো আমার শেষ রঙের তাস।

'একটা বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে, বুঝলে না', আমার উপস্থিত মুহূর্ত্তের উদ্ভাবনাশক্তির উপর নির্ভর করে' আমি বলতে লাগলুম, 'ভাড়া নাম-মাত্র দিতে হবে। যতদিন খুসি থাকো। একেবারে ভালো হ'য়ে না ওঠা পর্য্যন্ত তোমার কলকাতায় ফেরবার দরকার নেই।'

'কিন্তু', একটু চুপ করে' থেকে ভবভূতি বললে, 'আর-সব খরচ ?'

'পুরীতে আবার খরচ কী ? জলের মত সব শস্তা। আর রেল-ভাড়া—সে একটা ব্যবস্থা হবে'খন।' কথাটা বলতে-বলতে আমার নিজের দুর্দ্দশার মনে পড়লো। অসময়ে চুপ করে' গেলুম।

'সব ঠিক করে' ফেলেছো ?' ভবভূতির অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে একটু উৎসাহ ফুটে ওঠবার চেষ্টা করলো।

'হ্যাঁ, সব ঠিক', আমি তাড়াতাড়ি বলতে লাগলুম। 'বাড়িটা একেবারে সমুদ্রের উপর—তুমি বারান্দায় শুয়ে থাকবে সব সময়—তা'তেই ভালো হ'য়ে উঠবে। ডাক্তার তো বলেইছেন ওজোনই জীবন। একটু সবল হ'য়ে উঠলে আস্তে-আস্তে—'

ভবভূতি যেন মনে-মনে ছবি দেখছিলো, হঠাৎ বলে' উঠলো, 'সমুদ্র আমি কখনো দেখি নি।'

'একটু সবল হ'য়ে উঠলে', আমি বলে' চললুম, 'একটু-একটু বেড়াতে পারবে; আর একেবারে যখন সেরে উঠেছো তখন সমুদ্র-স্নান করে' নতুন মানুষ হ'য়ে ফিরে আসবে কলকাতায়। সমুদ্র-স্নান—মানে, শরীরটাকে ধোবা-বাড়ি থেকে কাচিয়ে আনা', অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের একটা উপমা চুরি করে' আমি শেষ করলুম।

ভবভূতির চোখ বুজে এলো।—'আ, যদি কখনো আবার

ভালো হ'য়ে উঠি, তা হ'লে নতুন করে' কত কিছুই আরম্ভ করতে পারবো। নতুন করে' কত রকমের লেখা। যদি অনেক সময় থাকতো, যদি—' কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে ভবভূতি বললে, 'চাকরিটা গেলো।'

'ও-চাকরি তোমার গেছে, ভালোই হয়েছে। ও কি তোমার করবার মত কাজ?' (সুখ, সুখ!—আমার প্রত্যেকটি কথা দুর্ম্মূল্য ইন্‌জেক্‌শনের চাইতে অনেক বেশি ফলকারী—আমি ওকে সুখে আচ্ছন্ন করে' দিলুম, মগ্ন করে' দিলুম।) 'ও-চাকরি কি তুমি এমনিই বেশিদিন করতে পারতে—না, তোমায় করতে হ'তো? তোমার বইগুলো বেরোতে আরম্ভ করুক না—তারপর আর তোমাকে পায় কে?'

'আমি বই থেকে টাকা আশা করি নে—'

'তোমার আশা করবার জন্যে অপেক্ষা করবে কিনা। টাকা একবার আসতে আরম্ভ করলে কে তা'কে থামায়!'

'এ-বইটা বেরোলে পরে', ভবভূতি কথাটা কার্য্যকরী ক্ষেত্রে নামিয়ে আনলে, 'হয়-তো কোনো বড় প্রকাশকের নজরে পড়তে পারে, যে টাকা দিয়ে আমার বই নেবে।'

'সে তো হ'লো বলে', আমি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে বললুম, 'তোমাকে আটকাবে এমন সাধ্য আছে কা'র? তোমার জয় হবেই। এখানে—এই বাঙলাদেশেই তোমার জয় হবে।'

'লোকে বলে, ভালো জিনিসের আদর এক সময়ে হয়ই।'

'তা না হ'য়ে পারে?' আমি খেলায় মেতে গেলুম, 'এতদিন তুমি যে-কষ্ট করলে, তা'র কি কোনো প্রতিদান হবে না? যে-ব্যর্থতা, যে-তিক্ততা, দুঃখের যে-তীব্রতা এতদিন তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয় করলো, তা কি সুখে সৌভাগ্যে সার্থকতায় দশগুণ হ'য়ে ফিরে আসবে না তোমার কাছে?'

'আসবে? তুমি ঠিক জানো, আসবে?'

মর্ম্মান্তিক প্রশ্ন। অসম্ভব প্রশ্ন। চিরন্তন প্রশ্ন। এক-এক সময় ভাবি, যক্ষ্মার অন্তিম অবস্থার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে, মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তির সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়েও ভবভূতি কি তা'র অনশ্বর সাহিত্যিক যশের নব-জিরুসালেমের জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্নে মুগ্ধ হয়েছিলো? না কি মুহূর্ত্তের শীতল, শান্ত দৃষ্টিতে সে তা'র নিয়তিকে উপলব্ধি করেছিলো —এক কণা ধুলোর মত সে তুচ্ছ, যা'কে তা'র মৃত্যুর দু'দিন পরে কেউ আর মনে রাখবে না, পরিবার-গণ্ডীর বাইরে যা'র অভাব কেউ কখনোই অনুভব করবে না? জানবার উপায় নেই। তবে শেষ যেদিন ওকে দেখি, আমার একবার সন্দেহ হয়েছিলো যে আমি ওর জন্যে যে-মোহ তৈরি করে' দিয়েছিলুম, তা এইবার ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে, হয়-তো কোনোকালেই ও সত্যি-সত্যি তা বিশ্বাস করে নি। একটা কাশির কাৎরানি শেষ হ'য়ে যাবার পর ও শান্ত হ'য়ে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলো। ওর মুখের বিবর্ণতা কেটে গিয়ে—

ক্ষয়রোগের শেষ অবস্থার যা লক্ষণ—তা রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে; কোটরগত চোখে অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা; হঠাৎ দেখলে মৃত্যুর এই প্রস্তাবনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য বলে' ভুল হয়। অনেকক্ষণ ভবভূতি রইলো চুপ করে', চোখ বুজে; তারপর হঠাৎ সেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিম্ন, অতি নিম্নস্বরে কানে-কানে বলার মত করে' জিজ্ঞেস করলে, 'ও কি সত্যি?'

'কী?'

'এই—আমার বই ছাপা হবার কথা?'

আমি চুপ করে' রইলুম। কী ছিলো বলবাব। মৃত্যু যখন এত কাছে থেকে একজনের মুখের দিকে তাকায়, তখন আর কী বলবার থাকে।

কয়েক মুহূর্ত্ত, ভবভূতির মৃত্যুময়, নির্নিমেষ দৃষ্টি আমার মুখের উপর অনুভব করলাম। তারপর আস্তে-আস্তে ও বললে, 'তবু তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।'

কিছু বলতে হবে বলে'ই আমি বললুম, 'এখন আর-কিছু ভেবো না, ভালো হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা করো।'

'না, এখন আর আমার কোনো ভাবনা নেই', ভবভূতি হাসবার চেষ্টা করলে। 'তোমায় শেষ একটা কথা বলে' যাই',

একটু চুপ করে’ থেকে সে আবার বলতে লাগলো, ‘আমি জানি, রামতনু, এতদিন আমি ভুল নিয়ে ছিলাম। যা-কিছু আমি লিখেছি, সব বাজে, সব রাবিশ। তুমি আমার মনে কষ্ট না-দেবার অনেক চেষ্টা করেছো ; কিন্তু কেন যে ও-সব পাগলামি করেছিলাম, এখন ভেবে অবাক লাগছে।’

সেই মুমূর্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে আবিদ্ধ, আমার পক্ষে এ-সব কথার কোনোরকম প্রতিবাদ করা অসম্ভব ছিলো। নীরবতায়, অসীম সময় থেকে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত খসে’ পড়তে লাগলো। তারপর, আসন্নমৃত্যু যক্ষ্মারোগীর মনে যে-তীব্র দুরাশা, বাঁচবার যে-প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, তা’রই প্রেরণায় ভবভূতি বলতে লাগলো, ‘কিন্তু এখনো সময় আছে। আমার মনে হয়, রামতনু, আমি মরবো না। আমি ভালো হ’য়ে উঠবো, শিগগিরই ভালো হ’য়ে উঠবো। তারপর—তারপর আর-একবার দেখা যাবে। তুমি দেখে নিয়ো, রামতনু, আমি লিখবো। লিখবো। সত্যি-সত্যি এমন জিনিস লিখবো—’

কিন্তু ভবভূতি তা’র সেই ভবিষ্যদ্বাণী শেষ করতে পারলে না। এই উত্তেজনায় আবার তা’র কাশি উঠলো ; রক্তে বালিশ লাল হ’য়ে গেলো, তবু কাশি থামে না। আর সহ্য করতে না পেরে আমি তখন-তখন সেখান থেকে বেরিয়ে গেলুম। সেই রাত্রেই ভবভূতি মারা গেলো।

এ-জন্য অপেক্ষা করে'ই ছিলুম; তবু যখন মনে হ'লো যে ভবভূতি একেবারে নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে, জলের রেখার মত মুছে গেছে বিশ্বের মুখ থেকে, চিরন্তন সময়ের মধ্যে তা'র ক্ষুদ্রতম কণা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, তখন কেমন একটু অবাক লাগলো। তা'র এত কষ্ট, এত চেষ্টা—তা'র এতদিনের দীর্ঘ সাধনার আত্ম-অত্যাচার, সব নিষ্ফল, শূন্য হ'য়ে গেলো। একদিনের জন্যও কেউ তা'কে মনে রাখবে না। বাঙ্‌লাদেশে অনেক লেখক আসবে, লাভ করবে খ্যাতি, ডুবে যাবে বিস্মৃতিতে —দু' একজন হয়-তো বা স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, কিন্তু কেউ কখনো জানবে না যে ভবভূতি নামের কেউ-একজন কখনো লিখেছিলো, আশা করেছিলো—শেষ পর্য্যন্ত তা'র আশার যূপে বলি দিয়েছিলো নিজের জীবন। এমন ভয়ঙ্কর ত্যাগ কা'কে কবে করতে শোনা গেছে? কিন্তু তা'তে কী এসে যায়? কিসেই বা কী এসে যায়— এই ত্যাগে, এই আত্ম-বিনাশে, এই সাধনায়? ও-সব জিনিসের কোনো মূল্য দিতে পৃথিবী প্রস্তুত নয়। পৃথিবী আর-কিছুই বোঝে না, শুধু বোঝে প্রতিভা। প্রতিভা যা দেয়—হ'তে পারে মদের, কি তা'র চেয়েও তীব্র কোনো নেশার ঝোঁকে; হ'তে পারে পেটের দায়ে; হ'তে পারে কোনো স্ত্রীলোককে কি কোনো রাজাকে খুসি করবার জন্যে; অবজ্ঞায়, অশ্রদ্ধায়; ভোরের দিকে নাচ থেকে ফিরে পোষাক ছাড়তে-ছাড়তে; এক বিকেলবেলায়

বসে'-বসে' আর-কিছু করবার নেই বলে' ; নিজের উপর কী অন্য কারো উপর রাগ করে' ; প্রচলিত জনরুচির কি কোনো নির্দ্দিষ্ট উপরিওয়ালার বিধান অনুসারে ; অনুরুদ্ধ হ'য়ে, বাধ্য হ'য়ে, অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—প্রতিভা যা দেয়, যা-কিছু ছড়িয়ে দেয় অবহেলায়, পৃথিবী তা-ই মাথা পেতে নেয়, তা-ই সযত্নে কুড়িয়ে-কাচিয়ে তা'র চিরকালের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে' রাখে। কিন্তু তা ছাড়া—যতই অচঞ্চল হোক্ আপনার নিষ্ঠা, আন্তরিক হোক্ উদ্দেশ্য, যতই আপনি সৎ হোন্, পরিশ্রমী হোন্, যত নিষ্ঠুর দুঃখই আপনি কেন সহ্য না করুন, পৃথিবী আপনার মুখের দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না। যে-সব ভালো-ভালো গুণের উপর মানুষের সামাজিক জীবনে এত জোর দেয়া হয়, জীবনের সর্ব্বোচ্চ ক্ষেত্রে তা'র অপরিসীম অর্থহীনতা।

তবু—তবু একবার এ-প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, এত ইচ্ছা, এত চেষ্টা, এমন দারুণ অধ্যবসায়, উদ্দেশ্যের এই ভীষণ সততা—এর কি একেবারেই কোনো মূল্য নেই? ভাবতে ভালো লাগে, ভবভূতি তা'র ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, অতীন্দ্রিয় কোনো সার্থকতা, পৃথিবী-অতীত কোনো পূর্ণতা—অন্য-কোনো জীবনে। মনে-মনে ব্রাউনিঙ্ আওড়াই : 'Not on the vulgar mass called "work" must sentence pass—' ইত্যাদি। আর আমাদের নিজস্ব রবীন্দ্রনাথ : 'জীবনে যত পূজা হ'লো না সারা' ইত্যাদি।

মুহূর্ত্তের জন্যও, নিষ্ফলতার এই মহিমায় যদি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করতে পারতাম। এমন মোহ যদি মিথ্যা জেনেও মনে স্থান দিতে পারতাম যে এখানে যা অসম্পূর্ণ, অকৃত, স্তূপীকৃত ভগ্নাংশ, অন্য কোথাও, কোনো স্বর্গে, কোনো ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে তা দীপ্ত হ'য়ে উঠছে নিটোল, নিখুঁত পরিপূর্ণতায়। কিন্তু আমরা যে জানি মৃত্যুই সর্ব্বশেষ সমাপ্তি, আমরা যে জেনেছি জীবন নিয়ে নিয়তির উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালিপনা—আমরা যে জানি অনেক-কিছুই আমরা জানি নে। কী করে' ব্রাউনিঙ্ কি রবীন্দ্রনাথের মত পরিতৃপ্ত প্রশান্তি নিয়ে আমরা বলতে পারি···না, আমাদের সব ব্যর্থতার অনিবার্য্য প্রতিষেধক-হিসেবে ঈশ্বরকে ব্যবহার করে', আমাদের সব ঋণের দায় স্বচ্ছন্দে স্বর্গের ঘাড়ে চাপিয়ে যে এতটুকু সান্ত্বনা লাভ করবো, সে-উপায়ও আমাদের নেই।